CHARU-PRABANDHA

(PROSE AND POETRY)

BY

LALMOHON VIDYANIDHI BHATTACHARYYA,

Late Deputy-Inspector of Schools, Dinajpur, Professor of Sanskrit, Cuttack College, Retired Headmaster Krishnanagar, Berhampur and Hugli Training Schools and author of "Kavyanirnaya" "Sambandha Nirnaya" etc.

THIRD EDITION.

চারু-প্রবন্ধ

(গদ্য ও পদ্য)

নদীয়া—শান্তিপুর—নিবাসী,

স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী-ইন্সপেক্টর, কটক-কলেজের

ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও

হুগলি ট্রেনিংস্কুলের ভূতপূর্ব্ব (পেন্সনপ্রাপ্ত)

প্রধান শিক্ষক, ও কাব্যনির্ণয়, সম্বন্ধ-

নির্ণয়, আর্য্যজাতির আদিম

অবস্থা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

এবং

ঢাকা, ইস্‌লামপুর রোডস্থিত

অতুল লাইব্রেরীর ম্যানেজার,

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ আনা। *Price Eight Annas.*

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

১। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর ১৯১২ সনের মধ্যবাঙ্গালা বৃত্তি পরীক্ষার এবং ১৯১১ সনের জন্য এণ্ট্রান্স ও মাইনর স্কুলসমূহের Class VI এর (ষষ্ঠ শ্রেণীর) পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ডিরেক্টার মহোদয়ের এই সোৎসাহ উপকার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

২। ডিরেক্টার বাহাদুরের আদেশে টেক্‌ষ্টবুক কমিটির জনৈক মেম্বরের পরামর্শক্রমে চারু-প্রবন্ধের পূর্ব্বসংস্করণের পদ্যাংশ হইতে তিনটি কবিতা পরিত্যক্ত এবং সেই স্থলে (১) মহম্মদের ঋণশোধ (২) নাজিরউদ্দিন (৩) রসাল ও স্বর্ণলতিকা, এই তিনটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য কবিতাগুলির ন্যায় এই তিনটি কবিতাও সংগৃহীত, আমার রচিত নহে। যে সকল মৃত ও জীবিত লেখকগণের কবিতা গৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। সূচীপত্রে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

৩। ঢাকা অতুল-লাইব্রেরীর ম্যানেজার স্নেহভাজন শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাধুতা, কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি গুণে প্রীত হইয়া শ্রীমান্‌কে চিরকালের নিমিত্ত চারু-প্রবন্ধের একমাত্র প্রকাশক নিযুক্ত করিয়াছি। বলিতে কি, শ্রীমানের যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতীত এই পুস্তক কখনই বর্ত্তমানাকারে প্রকাশিত হইত না। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীমান্ ধর্ম্মপথে থাকিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদনপূর্ব্বক সকলের প্রীতিভাজন হউক। ইতি—

শান্তিপুর, নদীয়া।
অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

পদ্যাংশ।

চারু প্রবন্ধ

Sreenath P c

রাজা প্রজার পূজ্য।

আর্য্যশাস্ত্রানুসারে মাতাপিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও রাজা অষ্টদিক্‌পালের অংশসম্ভূত বলিয়া অতি সম্মানের পাত্ররূপে সর্ব্বত্র উল্লিখিত আছেন *। পূজা, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্ম্য কার্য্যেও অগ্রে ভূস্বামীর পূজা হইয়া থাকে। নৃপতির সম্মানের ব্যতিক্রমে ঐ সকল ধর্ম্ম্য কার্য্য একেবারেই পণ্ড হয়। নৃপতিকে এতাদৃশ সম্মান করিবার কারণ এই যে, সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াই সকল সময়ে জনকজননী বা আত্মীয়কুটুম্ব দ্বারা সম্যক্‌-রূপে প্রতিপালিত হয় না। অনেকস্থলে বিশেষতঃ অতি দুঃখীর

* ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্যচ।
চন্দ্রবিত্তেশযোশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥৪॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যোনির্ম্মিতোনৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষসর্ব্ব ভূতানি তেজসা ॥৫॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যোমনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥৮॥

৭ অঃ মনুসংহিতা।

সন্তান কেবল রাজার শাসনে ও অন্নে প্রতিপালিত হয় ; রাজাই তাহাদিগের জীবনরক্ষণ এবং সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। প্রজার সুশিক্ষা ও ধর্ম্মনীতি সম্পাদন নৃপতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া সকল দেশেরই শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। রাজা তাহা না করিলেই দস্যু তস্করাদির সৃষ্টি হয়। রাজা সুশাসন করেন বলিয়াই প্রজাগণমধ্যে শান্তি বিরাজিত থাকে, প্রজাগণ মধ্যে বিবাদবিসংবাদ এবং তজ্জন্য অশান্তি জন্মে না। প্রজাগণ নিশ্চিন্ত থাকিলেই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। তাহাদের ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত রাজা নিরন্তর দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন। এবং কার্য্যতঃ তাহার প্রয়োগদোষ দেখিলেই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহার মূল উদ্দেশ্য এই, ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিরুপদ্রবে কালহরণ করে এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তি পাপকার্য্যের যথাযোগ্য দণ্ড পায়। ঈশ্বরের যাবতীয় বিধান যেরূপ জীবের মঙ্গলসাধনে নির্দ্দিস্ট, মহারাজের বা রাজার রাজনিয়ম তদ্রূপ প্রজার সর্ব্বতোভাবে কল্যাণের হেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রজাগণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপালন, শিক্ষিত, শিষ্ট, শান্ত ও ধার্ম্মিক করা রাজার যেমন কর্ত্তব্য তেমন আর কাহারও নহে। তজ্জন্য আর্য্যশাস্ত্রে রাজার সম্মান সর্ব্বোপরি নির্দ্দিষ্ট আছে।

রাজা স্বয়ং সমুদায় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন না ; ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কার্য্যপরম্পরার বিভাগ করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে সেই সেই কার্য্যের সুশৃঙ্খলাবিধান ও সুনিয়ম রক্ষা-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন।

তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ শাসন ও কার্য্যপ্রণালী দ্বারাই প্রজার ধন, প্রাণ, মান ও ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য। পাপের ফল দণ্ড, তজ্জন্য দুঃখ। পুণ্যের ফল জীবনের শান্তি, তন্নিমিত্ত সুখ।

যাঁহারা প্রজা পালন করেন, তাঁহারা রাজার প্রতিনিধি অর্থাৎ তদ্রূপ মান্য। তাঁহাদিগের অমর্য্যাদায় রাজার অবমাননা ঘটিয়া থাকে। যে রাজপুরুষ যে প্রকারের কর্ম্মকর্ত্তাই হউন, তিনি রাজার প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং নিজের পদমর্য্যাদার সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্টপদস্থ ব্যক্তিকেও ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিলেই রাজার অপমান হয়। অতএব রাজার প্রতিকূলে কোন কথাই বলা কর্ত্তব্য নহে। প্রতিকূলাচরণ করিলে তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া পাপী স্থির করা যায়। তজ্জন্য তাহার অপরাধের দণ্ডভোগ করাই উচিত ফল।

এই নিয়ম আর্য্যজাতির সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সুস্পষ্ট ও সম্যক্-রূপে লিপিবদ্ধ আছে। তদনুসারেই চিরকাল কার্য্য-পদ্ধতি নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে চলিয়া আসিতেছে।

এক্ষণে ইংরাজ ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন। তাঁহারাই সম্রাটের প্রধান প্রতিনিধি। দেশীয় রাজগণ এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ইংরাজের সুশাসনপ্রণালীর রীতি ও নীতি অনুকরণে প্রজাপালন ও শান্তিরক্ষা দ্বারা যশ অর্জ্জন করি-তেছেন। সুতরাং ইংরাজশাসনে প্রজাবর্গ যে নিরুপদ্রবে ও নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতেছেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

দেখ, পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি রাত্রিকালে নিশ্চিন্তভাবে সুনিদ্রায় সুখানুভব করিতেন ? দস্যুতস্করাদির ভয়ে সকলেই নিতান্ত কাতর থাকিতেন। বিদেশস্থিত প্রিয়তম ও স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যাদির সংবাদ পাইবার জন্য পূর্ব্বে মাসাবধি চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইত না। এখন একটি পয়সায় তিনদিনমধ্যে অতি দূরস্থিত ব্যক্তির সংবাদ পাইয়া কত সুখানুভব করিয়া থাকি। আবশ্যক হইলে এই দণ্ডেই বৈদ্যুত বার্ত্তাবহে এক মুদ্রার তৃতীয়াংশ দ্বারা সমুদায় ভারতের সংবাদ লইতে পারি, ইহা কি ইংরাজরাজের সুশাসনপ্রণালীর কার্য্যপরম্পরার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত নহে ? রাজবার্ত্তার সঙ্গেই সাধারণের বার্ত্তা অবাধে চলিতেছে। বিদেশে অর্থ প্রেরণ করা পূর্ব্বকালে বহুব্যয়সাধ্য ছিল, অথচ কোন প্রকারেই নিরাপদ ছিল না। এখন তদ্দণ্ডেই বার্ত্তাবহ-ব্যাপার-যোগে অতি অল্প ব্যয়ে দূরতম স্থানে অকুতোভয়ে অর্থ প্রেরিত হইতেছে। তাহার প্রাপ্তি বা প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়েও কোনপ্রকার বাধা জন্মে না।

রাজার ভাণ্ডারে ধনরাশির আগম ও নিগমজন্য যে নিয়মপত্র (অর্থাৎ নোট) প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা বাণিজ্য-কার্য্যের কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই তাহা বিদিত। উহার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষরূপে সাধারণে পরিজ্ঞাত আছে। অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক সুবিধা দৃষ্টে কোন্ ব্যক্তি ইংরাজশাসনের প্রশংসা না করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে পারেন ? শাসনপ্রণালীর সারবত্তা দেখিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, সর্ব্বসাধারণের সুখবর্দ্ধনমানসেই

শান্তিরক্ষকগণের হস্তে দণ্ডনীতি-বিষয়-কার্য্যসমূহের প্রাথমিক সমস্যার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সমর্পিত হইয়াছে। নিয়মাবলীতে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদর্শী হইয়া কার্য্য করিবার আদেশ আছে, স্বজাতি বা ভিন্ন জাতি বলিয়া ভেদবুদ্ধি দেখাইবার কথা নাই। বিচারকার্য্যে বাদী ও প্রতিবাদী, তাহাদিগের প্রতিনিধি (উকীল, মোক্তার) ও দর্শকগণের সমক্ষে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে দোষীর দণ্ড ও নির্দ্দোষ ব্যক্তির মুক্তিপ্রদান হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এরূপ সুনিয়মে বিচার-কার্য্য সুসম্পাদিত হইত না। অনেক সময়ে নির্দ্দোষ ব্যক্তিও দণ্ডিত হইত।

শিক্ষাপ্রণালীতে আপামরসাধারণ সকলেই পুত্রনির্ব্বিশেষে শিক্ষিত, বিনীত ও কৃতকার্য্য হইতেছে। কত লোকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় কৃতার্থতা লাভ করিয়া সংসারের অশেষবিধ উপকার-সাধন করিতেছে। রাজকীয় চিকিৎসালয় সকলের পক্ষেই অবারিতদ্বার। তথায় ঔষধ বিতরণ ও রোগীর পরিচর্য্যা দ্বারা লোকের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তন দ্বারা ধাত্রীগণমধ্যে জ্ঞানোন্নতি হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আমা-দিগের সংসারের পক্ষে সুখকর বলিতে হইবে। লোকের সর্ব্বত্র গতিবিধিজন্য বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকট এবং বৈদ্যুতিক যান নির্ম্মিত হইয়া সাংসারিক কার্য্যে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জাতিসাধারণের ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকারেই বাধা জন্মান হয় না। সুতরাং সকল জাতির ধর্ম্ম সমান ভাবেই আছে, ইহাও ইংরাজের বিশেষ সুখ্যাতির বিষয়।

অশরণ ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা ও ধনরক্ষার জন্য (কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস) অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রম, নিরুপায় ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত পূর্ত্তবিভাগে শ্রামিকগণের নিয়োগ, বিশেষতঃ আতুর, অন্ধ ও অকর্ম্মণ্য লোকের জন্য অতিথিশালা (আমস্ হাউস) সংস্থাপন করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়া আছেন। সামান্য-আয়সম্পন্ন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া দিবার জন্য এবং যাহারা অন্যের নিকট অর্থ ন্যস্ত করিয়া প্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দিহান, তাহাদিগের মৃত্যু ঘটিলেও তদীয় উত্তরাধিকারীর ঐ ধনপ্রাপ্তিবিষয়ে নিশ্চয়তার দৃঢ়বিশ্বাসবর্দ্ধননিমিত্ত সঞ্চয়ভাণ্ডার (সেভিং ব্যাঙ্ক) সংস্থাপন করিয়াছেন। ফলকথা ইংরাজ রাজ্যে সুখের ভাগ বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আদর্শ প্রশ্ন।

রাজা, মাতাপিতা ও গুরুজন অপেক্ষা অগ্রগণ্য কেন? কোন্ দেশের লোকেরা রাজাকে অষ্টদিক্‌পালের অংশসম্ভব জ্ঞান করে? সে দেশের নাম কি? এবং উহার চতুঃসীমা নির্দ্দেশ কর। ভারতের জলবায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা অবশ্যই ভূগোলশিক্ষায় অভ্যাস করিয়াছ। অতএব ভারতবর্ষের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য, ফল, মূল, পুষ্পাদির বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেও। রাজনিয়ম ও ঈশ্বরের নিয়মের সঙ্গে কিরূপে সামঞ্জস্য হইল? ইংরাজশাসনে প্রজার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধনের বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে অনুমান করা যায়? বিবাদ ও বিসংবাদের অর্থ কি? উভয়ের পার্থক্য বল। 'সুখস্বচ্ছন্দ' ইহা এক কথা অথবা পৃথক্ দুই শব্দের সংযোগমাত্র? ভিন্ন অর্থ থাকে প্রকাশ কর। ধর্ম্ম ও পাপকার্য্যের পাঁচটি শব্দ দেখাও। পূজা, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ এই তিনের বিভিন্নতা কি? অশরণ, নিরুপায়, আতুর,

মহারাণী ভিক্টোরিয়া

চারু-প্রবন্ধ

১৩ পৃষ্ঠা।

অকর্ম্মণ্য, দস্যু, তস্কর, ইহাদের অর্থ বল। 'দস্যু' ও 'তস্কর' এই দুই পদের অর্থের বিভিন্নতা প্রকাশ কর। অষ্টদিক্পালের অর্থ কি? প্রত্যেক দিকের অধিপতির নাম বল। 'অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রম' ইহা কি তপস্যার স্থান? যদি তাহাই মনে কর তবে বল কিরূপ ব্যক্তি কেমন ভাবে কিরূপ তপস্যা করে? সে তপস্যার কালের সীমা কতদূর এবং তাহাতে কি কেবল রীতি, নীতি ও সচ্চরিত্রতার বিষয় শিক্ষা হয়, না আর কিছু? কৃতকার্য্য, জাতিসাধারণ, ধর্ম্মসম্বন্ধ, অতিথিশালা, আশীর্ব্বাদ, অসারবত্তা, সুসম্পন্ন, নির্দ্দিষ্ট, সাম্রাজ্য, সুপদ্ধতি এই শব্দগুলির মধ্যে যে যে শব্দে সমাস আছে তাহা লেখ এবং এই সকলের ব্যুৎপত্তি দেখাও। 'নিরুপদ্রব' ও 'নিশ্চিন্ত' এখানে কোন্ সমাস হইয়াছে? ঐ সমাস কয়প্রকার? দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন কর। অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার এই শাস্ত্র কি জন্য লোকব্যবহারে প্রয়োজনীয়?

খ্রীষ্টীয়ান মহিলা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বিনী উন্নত-প্রকৃতি ললনা-জাতির আদর্শস্বরূপা। ভিক্টোরিয়ার চরিত্র ও আচারব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলে লোকের মনে তাঁহার বিষয়ে একপ্রকার বিশেষ ভক্তি জন্মে। তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী মহারাণীর বিষয় পাঠ করিলে যথার্থই জ্ঞানজ্যোতিবিকাশ হয়। তিনি সর্ব্বলোকবিখ্যাত মহারাণী। সুতরাং তাঁহার কার্য্যকলাপের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে পাঁচ খানি বৃহৎ গ্রন্থেও স্থান-

সমাবেশ হয় না। তাই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সংক্ষেপে তদীয় চরিত্রের এবং কার্য্য-কলাপের স্থূল স্থূল বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ বলিলেও ছাত্রগণের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে পারে। সেই জন্যই ভিক্টোরিয়ার বিষয়ে দুই-এক কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ উইলিয়াম নিঃসন্তান ছিলেন। ভিক্টোরিয়া তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা। পিতৃব্যের মৃত্যুতে ভিক্টোরিয়া তদীয় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারিণী হয়েন। আমরা কথায় শুনি, ইংরাজরাজ্যে সূর্য্য অস্তগামী হয় না। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ইংরাজরাজের রাজ্য ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই কিছু না-কিছু বিদ্যমান আছে। সুতরাং সূর্য্যের অস্তগমন অসম্ভব। ভিক্টোরিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সেই সমস্ত রাজ্যের অধিকারিণী হইলেন।

ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যাধিকারিণী হয়েন। তৎকালে ভারতের শাসনকার্য্যভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-নামক কোম্পানীর হস্তগত থাকিলেও, পরম্পরাসম্বন্ধে তিনিই ভারতের অধিশ্বরী ছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পর অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি স্বহস্তে ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তদবধিই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর শাসন অন্তর্হিত হয়। ১৮৩৭ হইতে ১৮৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত একবিংশতি বর্ষমধ্যে ভারতে ইংরাজকৃত যতপ্রকার সদনুষ্ঠান হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মূল (মহারাণী) ভিক্টোরিয়া।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সূত্রপাতে এই কথাটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে যে, অপকারীরও উপকারসাধনে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিবে না।

সামর্থ্য থাকিলেই তাহা সম্পাদন না করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করা হয়। অপকারী ব্যক্তি অপকার করিয়াছে বলিয়া, নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে পাপ জন্মে। এই সাধু গাথার দৃঢ়ীকরণে প্রকৃত খৃষ্টানগণ কহিয়া থাকেন যে, এক গণ্ডে শত্রু চপেটাঘাত করিলে অন্য গণ্ড শত্রুর সম্মুখে প্রদর্শন করা উচিত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন। সেই হেতু তদীয় পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহার সহিত রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিতেন ও তদীয় প্রার্থনা শুনিতেন। ভিক্টোরিয়ার মনে পরাজিত ও জেতৃজাতির প্রতি পক্ষপাত ছিল না। তিনি সমদর্শিনী ছিলেন বলিয়াই লোক-সমাজে সুযশ ও সুকীর্ত্তি লাভ করেন।

তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি, রাজা রামমোহন রায়ের প্রস্তাবে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী কর্ত্তৃক ভারতের হিন্দুজাতীয় মহিলাগণের মৃত স্বামীর জ্বলচ্চিতায় আরোহণ ও দেহসমর্পণ নিবারণ-বিধির কার্য্যতঃ সমর্থন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি, ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান। ঐ কার্য্যের উত্তর সাধক সর্ চার্লস্ মেটকাফ্ (১৮৩৬ খৃঃ যখন তিনি সামান্য দিনের জন্য প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারল হয়েন)। তৎপরবর্ত্তী কীর্ত্তি, ভারতীয় প্রজাগণকে দেশীয় এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য জিলাস্কুল এবং সকল স্থানে আদর্শ-বিদ্যালয়-সংস্থাপন এবং তত্ত্বাবধান-কার্য্যে পরিদর্শক-নিয়োগ। স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানী দ্বারা ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে বেথুন-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

তাঁহার তৃতীয় কীর্ত্তি, উচ্চতম ইংরাজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষার নিমিত্ত ঢাকা, কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরে কালেজ সংস্থাপনের আদেশ প্রদান। অবশেষে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্পা হয়েন। তদনুসারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র গ্রাম্য পাঠশালার সৃষ্টি হয়। এই উপলক্ষে নর্ম্মাল ও ট্রেনিংস্কুল প্রতিষ্ঠিত, তৎসঙ্গে কালেজ-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং নানাবিধ পুস্তক লিখিত, প্রচারিত ও দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহাই লোক-সমাজের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাজ্যোতিতে দেদীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৫৭ খৃঃঅব্দে সিপাহি-বিদ্রোহ-ঘটনার সময়ে এদেশ হইতে ভারতীয় প্রজার বিরুদ্ধে যত কথা বিলাতের মহা-সভায় উপস্থিত হইয়াছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং প্রতিকূলাচরণের বিধি প্রচারিত করিতে দেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানার হস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার থাকিলে প্রজার অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তখন তিনি স্বহস্তে ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করিলেন। ঐ কার্য্য ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সুসম্পন্ন হয়।

ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার- গ্রহণ- সময়ে ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহা ভারতীয় প্রজার পক্ষে অতি কল্যাণকর। ভিক্টোরিয়ার প্রতিজ্ঞায় স্বজাতি ও বিজাতির প্রতি বিভিন্ন-ভাব-রহিত। তদনুসারে ভারতীয় উচ্চ-কার্য্যে সমদর্শিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। হাইকোর্টের জজের পদে দেশীয় লোকের

নিয়োগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের আদেশ প্রচারিত এবং কার্য্যতঃ তাহারই প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদীয় সহিষ্ণুতা, মহত্ব এবং ঔদার্য্য-গুণে কত দোষী ব্যক্তি নিস্তার পাইয়াছে তাহার পরিসংখ্যা করা যায় না। তদীয় মমতা এবং নিস্পৃহতার লক্ষণে, এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন, জননীর নিকটে যেমন পুত্রগণ নির্ভীক ভাবে সকল কথাই কহিতে সমর্থ এবং জননী যেমন সকল সন্তানেরই কথা শুনিয়া থাকেন, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তদ্রূপই ছিলেন। কেবল কথায় অমায়িকতা ও স্নেহ দেখাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কার্য্যতঃই সংসাধন করিতেন। সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারে সমর্থ ছিল। তদীয় সৌজন্যের কথা মহামনা কেশবচন্দ্র সেন যেরূপে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে পরম দয়াবতী দেবকন্যা হইতে বিভিন্ন বোধ হয় না। এদেশীয় সাধারণ ছাত্রগণও তাঁহারই শাসন-গুণে অনেক সময়ে মহাসভা ও সাধারণ-সভার বশীভূত হইয়া নিতান্ত অকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই। তদীয় প্রবর্ত্তনায় ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী দ্বারা রেল-পথে বাষ্পীয় শকট পরিচালন এবং বৈদ্যুত বার্ত্তাবহের বিস্তার। তদীয় অভিমতি হেতু ভারতীয় প্রজার শাসন-কার্য্যে ও বিচার-বিভাগে পৃথক্ পৃথক্ রাজপুরুষের নিয়োগব্যবস্থার প্রস্তাবনা হয়। ইহা তাঁহারই ধর্ম্ম্য বুদ্ধির ও বিবেচনাশক্তির নিদর্শনমাত্র।

তিনি জর্ম্মণদেশীয় রাজকুমার প্রিন্স আলবার্টের পত্নী।

শ্বশুর ও পিতৃকুল উভয়ই অতি উচ্চ সম্রাটের বংশসম্ভূত। তিনি ধনে, পতি-পুত্র-পৌত্রে, অতুল ঐশ্বর্য্যে এবং পরিজনবর্গে এরূপ সৌভাগ্যবতী ছিলেন, যাহার তুলনায় অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায় না। তাদৃশী সৌভাগ্যবতী হইয়াও নিরহঙ্কার, বিদ্যাবতী, দয়াবতী এবং সর্ব্বগুণে গুণবতী ছিলেন। কেহ কখন তাঁহার প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা করিতে সমর্থ হয়েন না।

পতিবিয়োগ হওয়ার পর, তিনি আমরণ বৈধব্য-অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু কদাপি তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রকৃত পক্ষে স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাকে সাধ্বী রমণী বলিয়া সকলে ধন্যবাদ করিয়া থাকে। তিনি ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রধান ব্যক্তির সম্মানের পাত্রী ছিলেন।

আদর্শ প্রশ্ন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কে? তাঁহাকে কিরূপ প্রকৃতির মহিলা মনে কর? তাঁহাদ্বারা আমাদিগের কি কল্যাণসাধন হইয়াছে? ইংরাজ রাজ্যে সূর্য্য অস্তগত হইতে পারে না, ইহার তাৎপর্য্য কি? ভিক্টোরিয়া কোন্ খৃষ্টাব্দ হইতে কোন্ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও কোন্ সময়ে পরতন্ত্র হইয়া ভারতের শাসনকার্য্য করিয়াছেন? তিনি খৃষ্টান্ ধর্ম্মের কোন্ কথাটি মনে করিয়া শত্রুমিত্রে সমতুল ছিলেন? ভারতবর্ষীয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ললনাগণ ভিক্টোরিয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা করেন কেন? ভিক্টোরিয়া যে শত্রুমিত্রে সমতুল ছিলেন তাহার উদাহরণ দেখাও। তিনি ভারতশাসনসম্বন্ধে ও ভারতীয় প্রজার শুভবৃদ্ধিসাধনে যে সকল প্রস্তাব মহাসভায় করিয়াছিলেন

তাহার অধিকাংশ কার্য্যতঃ সম্পাদন করিয়াছেন, কি মৌখিক? ভারতীয় কোন মহামহিমান্বিত ব্যক্তির কার্য্যপরম্পরায় তিনি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়াছিলেন কিনা? সে ব্যক্তি কে? তাঁহার মৃতদেহ কি ভাবে কোথায় সমাহিত হয়? "ভিক্টোরিয়াকে সাধ্বী রমণী বলিয়া সকলে ধন্যবাদ করিয়া থাকে।" সাধ্বীশব্দের পুংবাচক শব্দ কি? সমুদায় বাক্যের পদপরিচয় কর। ধন্যবাদ শব্দের প্রতিবাক্য লেখ। সতীদাহ ও সহমরণ বলিলে কি বুঝায়? অমায়িকতা ও অকপটতা এই দুই শব্দের প্রভেদ কি? কিরূপ ব্যবহারকে স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা বলা যায়? এবং ঐটি একটি মাত্র শব্দ দ্বারা প্রকাশ কর। এই রাজ্ঞী কোন্ দেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন? সে দেশের নাম কি? ইহা ভূমণ্ডলের কোন্ ভাগে অবস্থিত? ভূগোল শিক্ষানুসারে তদ্দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণন কর। ইনি মহারাণী উপাধি কোন্ দেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন? সে দেশের সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমির কি সম্পর্ক আছে? উভয় দেশের দূরতা ও প্রাকৃতিক বিভিন্নতা প্রদর্শন কর। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী কোন্ দেশের রাজপুত্র? সে দেশের সঙ্গে তাহার পিত্রালয় বা তদধিকৃত ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা? মহারাণীর কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিতে হইলে আমরা কোন্ কোন্ প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া সুখী হইতে পারি? তাঁহার শাসনের পূর্ব্বে স্বজাতি ও বিজাতি এই বিভিন্ন ভাব মন হইতে তিরোহিত করিয়া কোন্ সম্রাট্ ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকে সুশাসনে আনিয়াছিলেন। তাঁহার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ঘটনার সংক্ষিপ্ত রচনা কর। তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী এবং কি জাতি ছিলেন?

রাণীভবানী।

উদার প্রকৃতির মহামতি ললনা।

আমরা জননীর নিকটে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করি। তদ্বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা না থাকিলেও সন্তানগণ তদ্রূপ প্রার্থনায় নিরস্ত হয় না। তাহার কারণ এই, জননী সন্তানের কামনা পূরণ করিতে পারিলেই সুখী হয়েন। মাতা সন্তানের জন্মাবধি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাহারই সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনে একান্ত যত্নবতী হইয়া থাকেন। সুতরাং মাতার নিকটে সন্তানের প্রার্থনা অসাধ্য সাধনের বস্তু না হইলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই সূত্রানুসারে প্রজাবর্গ ভূস্বামীর পত্নীর নিকটে ক্রন্দনপূর্ব্বক প্রার্থনা জানাইতে পারিলে তদ্বিষয়ে বিমুখ হয় না। ভিক্ষুকেরা গৃহস্থের বাটী ভিক্ষা করিবার সময় গৃহস্বামীকে সম্বোধন না করিয়া গৃহস্বামিনীকে মাতা বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিয়া থাকে। তাহার একটি আশা পূর্ণ হইলেই ঐ গৃহিণীর সমীপে আরও প্রার্থনা জানাইতে লজ্জিত, কুণ্ঠিত বা ভীত হয় না। অনেক সময়ে দয়াবতী নারীগণ আপনার ক্লেশকে ক্লেশজ্ঞান না করিয়া আপনি অনাহারে থাকিয়াও অতিথি-অভ্যাগতের বাসনা পূর্ণ করিয়া আপনাকে সুখী এবং অক্ষয়-স্বর্গ-বাসাধিকারিণী মনে করেন। এই প্রকৃতির যথাযোগ্য-গুণসম্পন্না একটি পরম পূজ্যা ও পুণ্যশীলার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক তদীয় কর্ম্ম-কাণ্ডের বিষয় কিঞ্চিৎ শুনাইতে পারিলে ছাত্রবৃন্দের

মানস-পটে একটি সুন্দর ছবি অঙ্কিত হইবে। উহা আনন্দজনক।

নাটোরের রাজা রামকান্তের নাম না শুনিয়াছে এমন ব্যক্তিই বাঙ্গালা দেশে বিরল। সেই মহারাজাধিরাজের পত্নী প্রসিদ্ধ-দানশীলা, পরদুঃখকাতরা, অতিবুদ্ধিমতী ও পরম-পবিত্র-চরিত্রা রাজ্ঞীর নাম রাণীভবানী। তিনি যে সময়ে পতির মরণান্তে রাজ্যাধিকারিণী হইলেন, সে সময় ভারতবর্ষের পক্ষে প্রকৃত দুঃসময়। দেশ অরাজকতাপূর্ণ। লোকসকল ভয়ে কম্পিত-কলেবর। কেহই স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার ও সুনিদ্রায় কালহরণ করিতে সমর্থ ছিল না।

অনেকের কুসংস্কার আছে যে, এদেশীয় রাজগণ কেবল রাজস্ব-সংগ্রাহক-মাত্র ছিলেন। তাঁহাদের অন্য কোন ক্ষমতা ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রজা-সমূহের সমস্তপ্রকার বিচারে অধিকারী ছিলেন। সেই হেতু তাঁহাদিগকে দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা বলিত অর্থাৎ তাঁহারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে ক্ষমতাবান্ ছিলেন। তবে নবাবের আজ্ঞা না হইলে বধসাধন করিতে পারিতেন না।

হিন্দু স্ত্রী-জাতির মধ্যে যিনি অপুত্রক হয়েন, তিনি স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট অনুমতি পাইলে দত্তকপুত্রগ্রহণ করিতে অধিকারিণী। তদ্দ্বারাই তাঁহার অপুত্রকতা রহিত হয়। তদনুসারে তিনি তদীয় স্বামী মহারাজ রামকান্ত রায়ের অনুমতি পত্রের নির্দ্দেশে রামকৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। সেই দত্তক মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রাপ্ত-ব্যবহার হইয়াই বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য

প্রকৃত ভক্ত ও সাধক এবং পরমেশ্বরের আরাধনায় রত হইলেন। তিনি তদীয় গ্রহিত্রী মাতার স্কন্ধেই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের শাসন ও তত্ত্বাবধানের ভার নিক্ষেপ করিলেন। যখন মহারাজ রামকৃষ্ণ মহাসাধক, বিষয়-বাসনায় একান্ত বিরত, তখন ইংরাজরাজ বঙ্গদেশের শাসন-ভার গ্রহণোপলক্ষে বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানেই যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। ভারতের প্রজাবৃন্দ দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অন্নকষ্টে হাহাকার করিতেছে। ধনশালী ও মানী ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার ভয়ে জ্ঞান-হীন ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারে একান্ত অক্ষম, সুতরাং এরূপ সময়ে রাণীভবানীর পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই সাহায্যকারী হইবে না মনে করিয়া, তিনি (রাণীভবানী) পুত্রের ঈশ্বরোপাসনায় কিঞ্চিন্মাত্র বাধা দিলেন না। স্বয়ং সমস্ত দায়িত্বের ভার লইলেন।

রাজ্যভার-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই এক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। দেশীয় মহারাজসমূহ, ধনাঢ্য বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্তবর্গের সভা হইতে এই প্রশ্ন আসিল যে, বর্গীর হাঙ্গামা (মহারাষ্ট্রীয়গণের দৌরাত্ম্য) এবং অন্যান্য অত্যাচারে বঙ্গদেশ উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে, এক্ষণে নিতান্ত অরাজকতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ সময়ে সৌরাজ্য সংস্থাপন ব্যতীত বঙ্গদেশের লোকের পরিত্রাণের উপায়ান্তর দেখা যায় না।

দ্বিতীয় সমস্যা তাঁহার একমাত্র কন্যা তারা সুন্দরী অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে। রাণীভবানী শোকে ম্রিয়মাণা। এরূপ সময়ে প্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজ রাজবল্লভ-প্রেরিত পণ্ডিতের মতে অল্পবয়স্কা

বালিকার পুনর্ব্বার বিবাহ-ক্রিয়া-সম্পাদন করা উচিত কি অনুচিত এরূপ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। রাণীভবানী এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন "বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। স্ত্রীজাতির পতিই দেবতা, স্ত্রীজাতি স্বামীরই অর্দ্ধাঙ্গমাত্র। সুতরাং পত্যন্তর গ্রহণ করা লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ এবং আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও পাপজনক। অপিতু স্ত্রীজাতির স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে মাত্র। তবে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি অনুচিত তাহার উত্তর সমাজপতি নবদ্বীপাধিপতি দিতে সমর্থ। আমি নিতান্তই অসমর্থ।"

এমন সমস্যার উত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে স্বীয় কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় দীন, দুঃখী, অনাথ ব্যক্তিবর্গের প্রতিপালন-মানসে অন্নসত্র সংস্থাপন করিলেন। তৎকার্য্যের পর্য্যালোচনায় এবং বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর সেবায় কন্যাকে নিযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। অচিরে কাশীতে রাণীভবানী দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করায় নিরুপায় ব্যক্তিবর্গ পরমানন্দিত হইল। কাশী-ধামে তাঁহার অবিশ্রাম অন্নদানে কেহই অভুক্ত থাকিত না। ইহাতে কে না বলিবে যে স্বয়ং অন্নপূর্ণা রাণী-ভবানীরূপে মানবমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান করিতেছেন।

অতঃপর রাণীভবানীর অন্নসত্রই কাশীধামে সমস্ত অন্নসত্রের আদর্শস্বরূপ হইল। পূর্ব্বে সামান্য সামান্য অন্নসত্র যদিও বিদ্যমান

ছিল সত্য, তথাপি রাণীভবানীর অন্নসত্রের তুল্য পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা অন্য কোন সত্রেই ছিল না। রাণীভবানীর সত্রে ভদ্র, অভদ্র, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, খঞ্জ এবং অন্যপ্রকার অক্ষম ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়স্থান পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদনুসারে তাহাদিগের প্রতিপালন হইত। বিদ্যার্থী ছাত্রগণও যথাযোগ্য রূপে ভরণপোষণ পাইত, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ঔদার্য্য ছিল। তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত বৃত্তিদানে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। এই কারণে বাঙ্গালা দেশে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে,

দানে রাণীভবানী, মানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
ধনে ধনকুবের বৰ্দ্ধমানাধীশ্বর।

তিনি কাশীতে কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রত্যহ দৈনিক পূজায় এবং অশরণ ব্যক্তিবর্গের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত বেলা তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত করিতেন। পরে স্বহস্তে ঘৃত-সৈন্ধব-যুক্ত একপাকের সিদ্ধান্ন আহার করিয়া, মুখশুদ্ধিবিধানপূর্ব্বক অপরাহ্নে স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজকার্য্যকালে সম্মুখভাগে যবনিকা পাতিত থাকিত এবং পরিচারিকা ও দাসীদ্বারা অর্থী ও প্রত্যর্থীর প্রার্থনা শ্রবণ করিতেন। এবং সত্যপথের পথিকগণকে জয়পত্র দিয়া নিজে সকলের নিকটে সুবিচারক বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াও কখন তাহার জন্য গর্ব্বিত হইতেন না। তাঁহার জীবন-কালেই ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত। এক রাজার পতনে অপর রাজার অভ্যুদয়ে

প্রজার পক্ষে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে, কিন্তু রাণীভবানীর শাসন-গুণে প্রজাগণ অরাজকতালক্ষণে পতিত হইয়াও বিশেষ বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। বিপদাপন্ন ব্যক্তিবর্গকে তিনি রক্ষা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ঔদাস্য বা শৈথিল্য করেন নাই।

যখন রাজ্যে শান্তি-স্থাপন হইল, তখন তিনি সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বোধ হইল, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণগণের এবং গুণিগণের দুরবস্থা হইয়াছে। তাঁহার অন্তঃকরণ দুঃখ-স্রোতে উদ্বেল হইল। তাঁহাদিগের দুঃখদূরীকরণ-মানসে তাঁহার অধিকারে দেবালয়-প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মোত্তরদান করিয়া এবং গুণের বিচারজন্য গুণান্বিত ব্যক্তির পুরস্কারস্বরূপ মহত্রা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধিকৃতপ্রদেশে তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

তিনি অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও, অতুল সম্পত্তির ভোগজন্য কদাপি কাহারও নিকটে প্রভুত্ব বা অহঙ্কার দেখান নাই। তাঁহার মনের ভাব দেখিলে কেহই তাঁহাকে দেবী হইতে কদাপি পৃথক্ মনে করিতে পারিত না।

তিনি সদাশয়া, সত্যবাদিনী, পরোপকারিণী, বিবেক-শক্তি-সম্পন্না, অদ্বিতীয়দানশীলা নারী ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া সাবিত্রী প্রভৃতির অন্যতমা বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন। তাদৃশী রমণী একমাত্র রাণী শরৎসুন্দরী দেবীকে দেখিতে পাই। রাণী শরৎসুন্দরী দেবী কেবল রাণীভবানীর পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই লোক-সমাজে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়া নিজের প্রশংসা শুনিতেছেন।

রাণীভবানী বিধবা রমণীগণকে নিজের সঙ্গে লইয়া সর্ব্বদা পূজা-পার্ব্বণ করিতেন এবং ধর্ম্ম-কথা শুনিতেন। রাণীভবানী বিদুষী ছিলেন। প্রত্যহ রাত্রিকালে বিধবা রমণীগণকে সমবেত করিয়া পুরাণ শ্রবণ করাইতেন। তাহাদিগের সদাচার ও সদ্ব্যবহার সম্পাদননিমিত্ত নানাবিধ উপদেশ দিতেন এবং নানাপ্রকার ব্রতানুষ্ঠান করিয়া, তৎকার্য্যে তাহাদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়া শান্তিলাভ করিতেন। তাহারাও তদীয় দৃষ্টান্তে সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। কদাচ দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কারণে তাহার অধিকারে অসহায়া ও নিরাশ্রয়া রমণীগণের জীবনোপায় ও সতীত্বরক্ষা হইয়াছিল। রাণী শরৎসুন্দরী পুঁটিয়ার রাজরাণী, তিনি রাণীভবানীকে আদর্শ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আদর্শ হইতেও অনুকৃতি বিশেষ প্রশংসার পাত্রী হইয়া গিয়াছেন। রাণীভবানীর অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল এবং পুত্রও তদীয় মতের অবিরোধী ছিলেন। সুতরাং রাণীভবানীর দানের ইয়ত্তা ও বাধা ছিল না। শরৎসুন্দরীর দান ও কার্য্যপরম্পরা গুণানুরোধেই ও সচ্চরিত্রতার নিদর্শন দৃষ্টে সুসম্পন্ন হইত। তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে দুর্গত ব্যক্তির দুঃখ দূর করিতেন। রাণীভবানীর কার্য্য অপ্রত্যক্ষে অনেক সময়ে সম্পাদিত হইত। তজ্জন্য কখন কখনও রাণীভবানীর মনে ক্ষোভ জন্মিত। কিন্তু রাজ্ঞী শরৎসুন্দরীর পক্ষে তাদৃশ দুঃখের কথা শুনা যায় না।

রাণীভবানীর গুপ্ত দানের কথা শুনিলে লোকে চমৎকৃত হইবেন। যাঁহারা পতি-পুত্র-বিহীনা নহেন অথচ দুর্দ্দশাগ্রস্ত,

কিন্তু লোকনিন্দা অথবা লজ্জাশীলতাবশতঃ রাণীভবানীর নিকট যাচ্ঞা করিতে একান্ত বিমুখ, ইহা যদি তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দুঃখ-দূরীকরণমানসে দাসী বা সখী দ্বারা অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও অর্থ দান করিতেন, উহা যেন কোন ব্রতানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ এবং ধর্ম্মাদানমাত্র। বস্তুতঃ রাণীভবানীর উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। সৎস্বভাবান্বিত স্ত্রীজাতির অভাবমোচন দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে সুমতির স্থৈর্য্যবিধান। এরূপ সদভিপ্রায়মূলক দানের পাত্রীর দর্শন পাইলে কত আনন্দিত হইতেন তাহা বলা যায় না।

রাণীভবানী প্রজাগণকে পুত্রনির্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। নিতান্ত অরাজকতার সময়েও তদীয় প্রজাগণ দুর্নীতির বশীভূত হইয়া কোন অকার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার রাজ্যে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কেহ ধর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারগ হয় নাই। ইহা নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। রাণীভবানীর চরিত্র ও কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে অনেকপ্রকার হিতোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ নারী চিরস্মরণীয়া ও সকলের ধন্যবাদের পাত্রী।

আদর্শ প্রশ্ন।

প্রজাগণ রাণীভবানীর নিকটে তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনা জানাইতে কুণ্ঠিত হইত না কেন? কিরূপ বিপদের সময় স্ত্রীজাতি হইয়াও তিনি পুরুষ অপেক্ষা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে নিজ অধিকারের প্রজা-বর্গের মঙ্গলসাধন করেন? সর্ব্বসাধারণের উপকারসাধনে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তিনি কি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন? তাঁহার

চরিত্রের আদর্শে অন্য কোন স্ত্রীলোক স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা দূর করিয়াছেন কিনা? তাঁহার নাম কর। রাণীভবানীর দানে প্রতিবন্ধকতা ঘটে নাই কেন? তাঁহার পুত্র দত্তক কিনা? তিনি কিরূপ লোক ছিলেন? রাণীভবানীর কন্যা বিধবা হইয়া কি কার্য্যে রত ছিলেন? রাণীভবানী কোন্ জিলার কোন্ স্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন? তিনি কেমন সময়ে রাজত্ব করেন? তৎকালে ভারতের শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল? তিনি কাশীধামে কি কীর্ত্তি সংস্থাপন করেন? সে স্থানটি ভারতের মধ্যে কিরূপভাবে কীর্ত্তিত হয়? তথাকার জলবায়ু, স্বাস্থ্য ও খাদ্যসুখ সম্বন্ধে যাহা জান বল? কাশীধাম পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে; বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নজাতিবর্গ আর্য্যজাতির কিরূপ কার্য্য ও ঘটনাবলী দেখিয়া পুণ্যভূমি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না? সে কার্য্যের সঙ্গে রাণীভবানী বা তাদৃশী কোন পতিব্রতা ললনার কোন সংশ্রব আছে কিনা? নাটোর রাজ্যের প্রজাসমূহের সুখস্বচ্ছন্দতাজন্য রাণীভবানী কিরূপ কীর্ত্তিকলাপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন? এখনকার কালের একজন ভূস্বামীকেও কি তাঁহার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিতে পার? তবে নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসার কার্য্য বল। অতিথি ও অভ্যাগত এই দুইয়ে পরস্পর পৃথকত্ব কি তাহা বল? 'সৌরাজ্যসংস্থাপনের' ইহার প্রকৃত অর্থ কি? 'স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়' ইহার প্রতিশব্দ ও সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য বল। 'অন্তঃকরণ দুঃখস্রোতে উদ্বেল' ইহার সরলার্থ বল। 'সদ্ব্যবহার-সম্পাদননিমিত্ত' সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য বল। 'আদর্শ' ও 'অনুকৃতি'তে বিভিন্নতা কি?

মুসলমান ভদ্রমহিলা।

অনেকের এই কুসংস্কার আছে যে, মুসলমানজাতির কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহার অধিকাংশই মূর্খ, বর্ব্বর, আত্মম্ভরি, দুর্দ্দান্ত, দুঃশীল ও কলহপ্রিয়। বস্তুতঃ সে কথা সর্ব্বত্র শ্রবণযোগ্য নহে। ইতর লোকদিগের মধ্যে সেপ্রকার লোক আছে বটে, কিন্তু ভদ্র-পরিবারমধ্যে অনেকেরই সদাশয়তা, ভদ্রতা, বদান্যতা, দয়ার্দ্রভাব ও সৌজন্য বিশেষরূপে শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং মুসলমানজাতির সাধারণতঃ নিন্দা করা নিতান্ত অন্যায় ও অকর্ত্তব্য। যেখানে নিন্দা সেইখানেই শত্রুতা। *

মহাসম্রাটদিগের কথা এখানে উল্লেখ করার আবশ্যকতা দেখি না। সামান্য জমাদারদিগের মহিলাগণের স্বভাব চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন করিলেই অনুভূত হইবে যে, সকল জাতিরই ললনাগণ পুরুষ অপেক্ষা অশেষ-গুণ সম্পন্ন এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণে বিভূষিত।

বর্দ্ধমান জেলার চৌবিয়ার মোল্লা এবং হুগলি জিলার পাণ্ডুয়াসের পাণ্ডুয়ার সৈয়দবংশীয় জমাদারদিগকে অতি সম্ভ্রান্ত এবং এদেশীয় মুসলমানদিগের নেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদিগের অধিকৃত জমীদারীর অনেক স্থল হিন্দু প্রজায় সংবদ্ধ। ইতর মুসলমান প্রজাবৃন্দ জমাদারদিগের দোহাই দিয়া হিন্দু প্রজাগণের আচারব্যবহারের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে

---

* সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ॥

অভ্যুত্থান করিয়া থাকে। পরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মৌখিক শান্তি দেখায়।

চৌধরিয়ার জমীদারদিগের মহিলাবর্গ ও পাণ্ডুয়ার জমীদার-দিগের ললনাগণ, হিন্দুদিগের কষ্টের কথা শুনিলেই সর্ব্বদা নিজ নিজ স্বামী ও পুত্রদিগকে কহেন, ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রজাপালন করিতে দিয়াছেন, সকল প্রজার প্রতি সম দুঃখ ও সুখ অনুভব কর। কোন পক্ষেই পক্ষপাত করিও না। উক্ত জমীদারগণের স্ত্রীজাতির দয়ার্দ্রভাব ও সৌজন্য, প্রতিবেশী নীচ-জাতীয় হিন্দু দরিদ্ররমণীগণের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহা অতীব মহত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া সাধারণের প্রতীতি আছে। তাঁহারা বিধবা হইলে পত্যন্তর গ্রহণে পরাঙ্মুখ। নিয়তকাল ধর্ম্মোপাসনায় নিজ নিজ সময় অতিবাহিত করেন। ক্রিয়াকলাপে দুঃস্থ ব্যক্তির দুর্দ্দশা দূর করিতে ব্রতসংকল্প থাকেন। আমলা বা ভৃত্যবর্গের অন্যায়াচরণে অথবা অমনোযোগে কাহারও বিশেষ অনিষ্ট হইলে যদি স্বামী ও পুত্রাদি দ্বারা তাহার নিরাকরণ করিতে সমর্থ না হয়েন, তবে তাঁহাদিগের স্ত্রীধন দ্বারাও দরিদ্রের দুঃখ-মোচন করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতিবিশেষে পক্ষপাত দেখান না। ইঁহাদিগের পুরুষগণ কদাচ উদাসীনভাবে নিরপেক্ষ থাকিতে অসমর্থ হইলে ইঁহাদিগের মনে মনে নিতান্ত দুঃখ জন্মে। যাহাতে তাঁহারা সমদর্শী হয়েন, তাহার উপায়বিধানে সাধা-রণের শুভোদ্দেশে অকাতরে দীনদুঃখীকে দান করিয়া থাকেন। পুরুষেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "তোমাদিগের সুমতি হই-বার নিমিত্তই আমাদিগের এই কার্য্য।" এরূপ স্পর্দ্ধার কথা

উচ্চকুলপ্রসূতা মহিলাব্যতীত আর কাহার মুখে শোভা পায়?

স্বগ্রামস্থ অথবা সন্নিহিত গ্রামের কেহ পুত্রশোকতাপিত হইয়াছেন, এই কথা শুনিলে, ঐ দুই জমীদারের মহিলারা তাহার শোকে কাঁদিয়া থাকেন।

তাঁহাদিগের কর্ণগোচরে কেহ কাহারও প্রতি অন্যায় বা অসাধু আচরণ করিতে পায় না। স্ত্রীজাতির সম্ভ্রম ও সতীত্ব-রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদাই প্রজাগণমধ্যে সাধুচরিত্র ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহ দিবার জন্য স্বামী, পুত্র ও আমলাবর্গকে তাহার সদ্ব্যবহারের পুরস্কার দিবার অনুরোধ করিয়া থাকেন।

সামান্য ইতরশ্রেণীর মুসলমান পুরুষদিগের দুরভিসন্ধি দেখিয়াই, লোকে মুসলমানজাতির স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই একশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা পান। বস্তুতঃ সংসারে সাধুশীল স্ত্রীজাতি অপ্রত্যক্ষভাবেই পরমেশ্বরের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা দেবীর ন্যায় লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহারা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের পাত্র এবং লোকমণ্ডলে সুখ্যাতির আধারস্বরূপ। উচ্চশ্রেণীর ভদ্রমুসলমানজাতির ললনাগণমধ্যে প্রকৃত পরহিতৈষিণী ও উদারপ্রকৃতির বদান্যা রমণীর অভাব নাই।

ইঁহাদিগের সন্তানপরম্পরাও শিষ্ট, শান্ত, ভদ্র ও দয়ার্দ্র। এই দুই বংশের পুরুষগণও সৌজন্যে ন্যূনতা দেখান না। অনেকেই পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সম্মানিত বিচারকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। এখনও দুই একজন বিচারক পদে ও শাসনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগেরও সুখ্যাতি ব্যতীত নিন্দা শুনা যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের মৌলবি সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব এবং পশ্চিমবঙ্গে হুগ্‌লি জিলার ফুরফুরিয়া গ্রামে মৌলবি সখাওৎ হোসেন সাহেবের তুল্য নিরপেক্ষ সদাশয় বিচারক অতি বিরল। ইঁহারা উভয়েই সব্‌জজ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই স্বজাতি-বিজাতি-ভিন্নভাব-রহিত ও নিরপেক্ষ লোক ছিলেন। তাঁহা-দিগের সহিত যাঁহাদিগের পরিচয় ছিল, তাঁহারা শত শত ধন্যবাদ করিয়াছেন। পাণ্ডুয়ার সৈয়দবংশীয় মহম্মদ নবী সাহেব ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে শাসনকার্য্যে পক্ষপাতপরিশূন্য বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। গুণের মহিমাই সর্ব্বত্র শোভা পায়। দোষরূপ অন্ধকার সকলকেই কুপথে পাতিত করে।

আদর্শ প্রশ্ন।

মুসলমানজাতির প্রতি সাধারণে কি কুসংস্কার আছে? উহা প্রকৃত কি অপ্রকৃত? ইহাদিগের ভদ্রপরিবারমধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ অনেকাংশে উচ্চ, এ কথা বলে কেন? যে সদ্‌গুণে মনুষ্য পদবাচ্য হওয়া যায় তাহা কি মুসলমান স্ত্রীজাতির নাই? দুই এক ঘর উচ্চশ্রেণীর মুসলমান পরিবারের স্ত্রীরত্নের সদ্ব্যবহারের কথার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। মুসলমান জাতির প্রতি সাধারণের যে কুসংস্কার আছে উহা কোন্ সম্প্রদায়বিশেষের কুব্যবহারে উৎপন্ন হইয়াছে? ভদ্রবংশের সন্তানপরম্পরার মধ্যে ভদ্রতা জন্মে, এই বাক্যের দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য দুই একটা স্থান নির্দ্দেশ কর। 'ইঁহাদিগের সন্তানপরম্পরাও শিষ্ট, শান্ত, ভদ্র ও দয়ার্দ্র', এই বাক্যে ক্রিয়া দেখাও এবং যে পদে সমাস আছে তাহার ব্যাসবাক্য লেখ। শিষ্ট, শান্ত, ভদ্র এই তিনের ব্যুৎপত্তি লেখ। "বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান" ইহার তাৎপর্য্য কি? "অপ্রত্যক্ষভাবে" ইহার সরলার্থ বল। "স্বজাতিবিজাতিভিন্ন-ভাবরহিত" তাৎপর্য্য ও সমাসবাক্য বল।

রাজা রামমোহন রায়

চারু-প্রবন্ধ — ১২ পৃষ্ঠা।

Sreenath Press Dacca.

পুরুষোত্তম রাজা রামমোহন রায়।

পদ্মের শোভা ও সদ্‌গন্ধ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলেও অন্তর্হিত হয় না। তদ্রূপ মণিকাঞ্চনাদি মহারত্ন কুস্থানে পতিত হইলেও, উহার দ্যুতি কদাপি কেহ নষ্ট হইতে দেখিয়াছেন কি? জলের স্বচ্ছতা ও মিষ্টতা কোন কারণবশতঃ মলিন ও বিস্বাদ হইলেও কেহ উহার স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়াছেন কি? অগ্নি সর্ব্ব বস্তুই ভোজন করিয়া থাকে, উহাদ্বারা কি অনলের পবিত্রতা ও দাহিকা শক্তির অপক্ষয় দেখা যায়? কদাপি না। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন, তেজস্বী ব্যক্তি সর্ব্ব কার্য্য করিতে সমর্থ। যদিও সামাজিক ব্যবহারে মহামহিমান্বিত ব্যক্তির স্থলবিশেষে পদস্খলন হয়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। তাঁহার গুণগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আমরা এই প্রবন্ধে যে মহারত্নের নামোল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি ভারতের রত্নবিশেষ এবং চিরকাল সকলের স্মরণ্য ও শিরোমণিরূপেই আদৃত থাকিবেন। তাঁহার দোষ কেহ দেখিবে না, গুণানুকীর্ত্তনই করিবে।

রাজা রামমোহন যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ধরিলে, তাহার আদি পুরুষ মহামণির খনি বলিয়া লোকের নিকটে আবহমান কাল আদৃত ও কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি শাণ্ডিল্য ঋষি। তাঁহা হইতেই বেদ বেদাঙ্গের ভাষ্য ও সূত্রব্যাখ্যা হইয়াছে। সেই শাণ্ডিল্যের অন্বয়ে যাঁহারা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্র বলিয়া পরিচয় দেন।

শাণ্ডিল্যের বংশে কত ঋষি ও কত মহাত্মা জন্মপরিগ্রহ করিয়া লোকসমাজের কত উপকারসাধন করিয়াছেন, তাহার সীমা করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে ছাত্রগণের মনস্তুষ্টির জন্য ইদানীন্তন কালের কয়েকজনের নাম নির্দ্দেশ করিব, যথা—ভট্টনারায়ণ আদিশূরের পুত্রেষ্টিনামক যজ্ঞে আনীত পঞ্চ মহর্ষির একতম। তিনি বেণীসংহারনামক নাটক-প্রণেতা মহাকবি। তাঁহার অধস্তন বংশে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। ইঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্বনামক স্মৃতিপদ্ধতি অনুসারে বঙ্গীয় আর্য্যসমাজের আচারব্যবহার ও দণ্ডনীতি চলিয়া আসিতেছে। ভট্টনারায়ণের পুত্র নীপ কেশরগ্রামী। তদীয় বংশে শিবসংকীর্ত্তন-গ্রন্থপ্রণেতা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয়কবি। বন্দ্যঘটীয়কুলজ্ঞ দেবীবর ও ধ্রুবানন্দ মিশ্র, ইঁহারা উভয়েই অদ্বিতীয় কবি ও মহা পণ্ডিত ছিলেন। ধ্রুবানন্দের মিশ্রগ্রন্থ আর্য্যসমাজের এক অদ্ভুত পদার্থ। ইহাতে ব্রাহ্মণ ও তৎসংসৃষ্ট সমাজের সমুদায় ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। সুতরাং উহা দ্বারা পূর্ব্বতন ও আধুনিক সমাজের সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় অনায়াসে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আমরা রামমোহন রায়ের কথা বলিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি. তাহা প্রকাণ্ড বলিয়াই দূরত্বাব লক্ষণ অনুভব করিতে পারি নাই; কিন্তু আরব্ধ বিষয়ের সঙ্গে যাহার সংস্রব আছে তাহারই আলোচনা না করিলে প্রবন্ধ সংলগ্ন হয় না বলিয়া অগ্রে তাহাই লিখিত হইল।

ইনি সেই মহাকবি ভট্টনারায়ণের পুত্র বন্দ্যঘটীয় আদিবরাহের পঞ্চবিংশপুরুষ রামকান্ত রায়ের পুত্র। ইঁহার নিবাস

রাধানগর; জিলা হুগলি। ইঁনি বিংশতি-বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে রংপুরের কালেক্টারীর সেরেস্তাদারপদ লাভ করেন। ঐ পদ এখনকার ডেপুটী কালেক্টারের পদের অপেক্ষাও গুরুতর ছিল। তদীয় কার্য্যপরম্পরায় কালেক্টার সাহেব তুষ্ট হইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নিকটে যে প্রশংসা করেন, তাহাতে এই সকল কথা লিখিত আছে।—এমন শিষ্ট, বিনীত, তেজস্বী, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বিচারক, বাগ্মী, উদারচেতা, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, সংস্বভাবশালী, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দ্বিতীয় দেখিতে পাই না। অপিচ আরবী, পার্শী, ইংরাজী, প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী ও বিশেষ কার্য্যক্ষম বলিয়াই আমার বিশেষ বিশ্বাস ও অনুভব হয়।

রামমোহন রায় বাল্যকাল হইতেই সমবয়স্কদিগের নিকটে নিতান্ত প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বিদ্যাভ্যাস কালে সতীর্থদিগের উপরেই অধিষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন। যে কালেক্টার সাহেব এইরূপ সুখ্যাতি করিয়া গেলেন, তাহার পরিবর্ত্তনে অন্য কালেক্টার সাহেব তাহার তেজস্বিতা দেখিয়াই বিরক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কার্য্যদর্শিতায় তাঁহার নিকটে পদে পদে পরাস্ত হইতে লাগিলেন। রামমোহন অতি সূক্ষ্মধীশক্তিপ্রভাবে তাঁহার মনোমালিন্য অনুভব করিয়াই নিজের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, তিনি একাকী পদব্রজে তিব্বতদেশে উপস্থিত হইলেন। ইহা মহাপ্রস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ কার্য্যে গিরিলঙ্ঘনাদিব্যাপারে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি এখনকার লোক অনুভব করিতে সমর্থ?

এখন বাষ্পীয়যানাদি দ্বারা দূরপথপর্য্যটনকষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে, বলিতে হইবে। তিনি এত কষ্ট করিলেন কেন, তাহা কি কেহ অনুভব করিতে পারেন ?

তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের বিচার করিবার জন্য তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা এবং ঐ ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের মূলগ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন। ঐ ভাষার পারদর্শিতা লাভ হওয়াতে তাঁহার তিব্বত গমনের সমস্ত ক্লেশশান্তি হইল। তথা-হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়াই, হিন্দুধর্ম্মের সারগ্রন্থ বেদ-বেদাঙ্গ এবং দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনায় একান্ত মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বাল্যকালেই পিতৃভবনে ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় তাঁহাকে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় নাই। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় অল্পায়াসে অধিকারী হয়েন। তাঁহার মেধাশক্তি এবং বুদ্ধির প্রতিভার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি অনায়াসেই অভ্যস্ত ভাষাসমূহের ইংরাজি ও বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে পারিতেন। অনেকেই বলেন, রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না।

রাজা রামমোহন ভারতীয় তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে সাকার উপাসনা অর্থাৎ প্রতিমাপূজার ভাব দূরীভূত হইল। তিনি পরব্রহ্মের উপাসনায় রত হইলেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, পরোপকারিতা এবং আরব্ধ কার্য্যে অধ্যবসায় দেখিয়া

লোকে চমৎকৃত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরেই কলিকাতায় নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম ধর্ম্মব্রাহ্মসমাজ। উহা জোড়াশাঁকোতে দেদীপ্যমান আছে। তিনি ১৭৫১ শকাব্দের ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার ঐ সমাজপ্রতিষ্ঠা করেন। উহা তাঁহার কীর্ত্তিশৈলের একটি প্রধান চূড়া। তাঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি (হিন্দু জাতির অতি নিষ্ঠুরাচরণে পতির মরণে) সতীর দাহনিবারণ। ঐ কার্য্যের (আইন) ব্যবস্থা তাৎকালিক গবর্ণর-জেনারেল মহামহিম পরম দয়ালু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক দ্বারা সমাধা করেন। আইনের মর্ম্ম এই, সতীদাহের অনুকূলে যাহারা সংস্পৃষ্ট থাকিবেন, তাহারা নরহত্যার অপরাধে দণ্ডনীয় হইবেন। দণ্ডনীতির এই ব্যবস্থা স্থিরতর হইল। এই শুভকর কার্য্য দ্বারা রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক লোকসমাজে চিরস্মরণীয় আছেন।

রামমোহন রায় ১৭৭৬ খৃঃঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ খৃঃঅব্দে দিল্লীর বাদসার পেন্‌সনবৃদ্ধিনিমিত্ত ঐ বাদসা কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজোপাধি লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। ইংলণ্ডের রাজসভায় তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি, দেখিলে তাঁহাকে যথার্থ রাজা বলিয়া সকলেরই প্রতীতি জন্মিত। রাজা রামমোহনের সৌম্যাকৃতি দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতেন। তাঁহার বিনয়নম্র বক্তৃতার সঙ্গে তেজোগর্ভ বাক্যে তিনি সকলেরই নিকটে আদৃত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৮৩৩খৃঃ অব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ব্রিষ্টল নগরে জ্বররোগে

পীড়িত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুনিবন্ধন ইংলণ্ডের সভাভব্য ও সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সমাহিত হয়। তদীয় সঙ্গী ও পালকপুত্র রাজারাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন।

এই রাজারাম হরিদ্বারের পথিমধ্যে সদ্যপ্রসূত ও প্রক্ষিপ্ত শিশুরূপে এক সিবিলিয়ান্ কর্ত্তৃক রামমোহন রায়ের নিকটে প্রদত্ত হয়েন। সাহেবের নাম ডিউক, তথাকার শাসনকর্ত্তা ও বিচারক। রামমোহন রাজারামকে নিজের পুত্র রমাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন।

রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় প্রসিদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল, বাগ্মী, অতি বুদ্ধিমান্, সভাভব্য ও সুন্দরাকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। যৎকালে দেশীয় ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারাসনের জজের পদে মনোনীত হয়েন, রমাপ্রসাদ রায়ই জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হয়। তিনি নিয়োগ পত্রও পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈবাৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, জজের আসনে উপবেশন করিতে পারেন নাই।

মহামতি রাজা রামমোহন যৎকালে ভারতবর্ষে ছিলেন, তৎকালে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে বিতণ্ডা করিয়া নিজে পরাস্ত হইলেও তাহাতে সুখজ্ঞান করিতেন। তাহার উদাহরণস্বরূপ এখানে একটা বিতণ্ডা ও প্রতিবাদ দেওয়া গেল। যথা—

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি উপহাসপূর্ব্বক বলিলেন,—

মন রে ভ্রান্তি তোমার—
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার ;
সর্ব্বত্র যে বিভু থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে।
তুমি বা কে, কে বা আনে কাকে, একি চমৎকার ॥
সমস্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে।
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, একি ব্যবহার।
একি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব
দিয়ে কারে কর বা স্তব এ বিশ্ব যাঁহার ?

সাকারোপাসক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম দিগম্বর সিদ্ধান্ত। ইনি একজন পরম জ্ঞানী, প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিতবক্তা ও দর্শনশাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। তাহার উত্তর এই —

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার
আবাহন বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।
সর্ব্বত্র পূরিত বায়ু গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয় জীবন সঞ্চার।
জগন্মাতা জগন্ময়ী যখন কাতর হই
বলি এস ব্রহ্মময়ী কর মা নিস্তার।
জড় জীব জড় করি যাঁহার সাধনা করি
ফল, জল, ধ্যান জ্ঞান সকলি ত তাঁর।

এই উত্তর পাইয়া রাজা রামমোহন এক মাসিক সংবাদ-প্রবন্ধ বাহির করেন, উহার নাম হিন্দুমোহমুদ্গর। উহার বিরুদ্ধে হিন্দুরাও এক মাসিক পত্র বাহির করেন ; তাহার নাম পাষণ্ড দলন। এই উভয় পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদাননিবন্ধন

৩

রামমোহন রায় কর্ত্তৃক গদ্য লেখার পারিপাট্য আরব্ধ হয়। গদ্য রচনায় লোকে বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। ঐ দৃষ্টান্তে ক্রমে সমাচারচন্দ্রিকা, প্রভাকর ও ভাস্করাদি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে গদ্যরচনার সংস্করণ হইতে আরম্ভ হইল। সে যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণসৃষ্টিবিষয়েও রামমোহনের দৃষ্টি পড়িয়া-ছিল। তদ্দ্বারাই প্রথমতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্র লিখিত হয়। তদীয় মুদ্রিত ব্যাকরণ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রথমে কেরী প্রভৃতি সাহেবগণ ব্যাকরণ লিখেন; তৎপরে পরিশুদ্ধরূপে ভগবচ্চন্দ্র বিশারদের ব্যাকরণরচনা হয়। যিনি যাহাই করুন বা যাহাই বলুন,রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের যত উপকারসাধন হইয়াছে, এতাদৃশ উপকার অন্য কোন সাধু পুরুষ দ্বারা হয় নাই।

তিনি লোকের নীতি ও হিতশিক্ষার জন্য বিশেষতঃ সত্যকথন শিক্ষার জন্য অশেষপ্রকারে যত্ন করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত মুক্তা-হস্তে নিজের অর্থ অজস্র ব্যয় করিতেন।

রাজা রামমোহন যেমন উচ্চ সভায় ভ্রমণ করিতেন, তেমনি বালকবালিকা এবং নিঃস্ব ও অনুপায় ব্যক্তির সদনেও পরিভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি শিশুগণের সঙ্গে হাস্য কৌতুক ও তাহাদিগের সঙ্গে সমানরূপে খেলা দৌড়াদৌড়ি করিয়া পরমানন্দিত হইতেন। এবং তদবস্থায় কোন সম্মানের পাত্রকে সম্মুখে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে তাঁহার মর্য্যাদারক্ষণপুরঃসর যথাযোগ্য কথোপকথন করিতেন। গৃহের দাসদাসীগণও তাঁহাকে সরলান্তঃকরণ ও নিরীহ পুরুষ বলিয়াই জানিত।

তিনি ক্ষুধার সময় আহারের উত্তম সামগ্রী, শয়নের সময় উত্তম শয্যা পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। নিজে সুন্দর পুরুষ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বিলাসিতাও ছিল। কিঙ্কর ও কিঙ্করীবর্গ তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিলেই পুরস্কৃত হইত। কিন্তু কেহ অকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম করিলে তিরস্কৃত হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিত। রাজা রামমোহনের সখা বা সখীগণ কদাপি তাঁহার বিরস বদন দেখেন নাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে হাস্য পরিহাস সহকারেই সকল বিষয়ের সমাধান করিতেন। তাঁহাদিগের প্রার্থনা বা মতের বিরুদ্ধ হইলেও, তাঁহারা বিরক্ত হইতে পারিতেন না। এতাদৃশ অসামান্য গুণসমূহ থাকাতেই তিনি লোকসমাজে মাননীয় ও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তদীয় দৃষ্টান্তে যদি কেহ চলিতে পারেন, সে ব্যক্তি অবশ্যই একজন মহাপুরুষ বলিয়া কথিত হইতে সমর্থ হইবেন।

রাজা রামমোহন কি প্রকারে এতাদৃশ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মূল সূত্র এই।—

তিনি বাল্যকাল হইতেই মাতাপিতা ও গুরুজনের আজ্ঞানুসারে চলিতেন। তাঁহারা যাহা হিতজনক বলিয়া উপদেশ দিতেন তদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিতেন না। কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে, যখন পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন শিক্ষকের নির্দেশানুযায়ী কার্য্য করিতেন, একমুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিতেন না। নির্দ্ধারিত নিয়মে সকল কার্য্যই করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত যখন ক্রীড়া করিতেন তখনও শিক্ষার বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিলে খেলায় বিশেষরূপ মনোযোগ দিতেন না।

প্রিয় সখাদিগকে কহিতেন, আজ আমার শিক্ষণীয় বিষয় সুসম্পন্ন হয় নাই, খেলা করিতে পারিব না।

উপনীত হওয়ার পরই, মন্ত্রতন্ত্র বিশেষরূপে অভ্যাস করেন। তদবধি সমস্ত বিষয়েরই মর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে বিচার না করিয়া সুস্থ-চিত্ত হইতেন না। এবং সকল বিষয়েই যুক্তিযুক্ত মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। দৃঢ়তর অধ্যবসায়সম্পন্ন লোক ছিলেন বলিয়াই অসাধ্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরে ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠায় একান্ত মতি থাকাতেই, সাংসারিক সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই হেতু লোকে বলে পদ্মরাগমণির খনিতে তুচ্ছ কাচের উৎপত্তি সম্ভবে না। পদ্মরাগমণিই জন্মে। তবে যে অনেক সময়ে অপদার্থ ব্যক্তির সম্ভব দেখা যায় সে কেবল সন্তানের প্রতি মাতাপিতার মমতাহেতু সন্তানের শিক্ষা-দানবিষয়ে অমনোযোগ ও আদরজনিত কার্য্যের আতিশয্য নিবন্ধন।

আদর্শ প্রশ্ন।

রাজা রামমোহন রায় মনুষ্য, মনুষ্যমাত্রেরই কিছু-না-কিছু দোষ থাকিবার সম্ভাবনা। রামমোহনের দোষের কোন উল্লেখ হইল না কেন? দোষ গুণ না বলিলে চরিত-কথা ঠিক হয় না। অতএব এক কথায় সে বিষয়ের মীমাংসা কর। রামমোহনের কীর্ত্তি-পতাকার সঙ্গে অন্য কোন মহাত্মা পুরুষ ও পরম দয়াবতী মহিলার কোন বিশেষ সংস্রব আছে কিনা? উহাতে ভারতে কি অশুভবিনাশ হইয়াছে? শাণ্ডিল্য গোত্রের মহামহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গের কতকগুলির নাম নির্দ্দেশ কর। দুই এক জনের কৃতিত্ব দেখাও। রামমোহনের ব্যবহার, চরিত্র ও কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দেও। তিনি কোন্ রাজবংশসম্ভূত বলিয়া তোমার

জ্ঞান আছে ? তাঁহাদ্বারা শিক্ষাসমাজের ও সাধারণের কি মঙ্গল সাধিত হইয়াছে ? তিনি মহাপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য কি অযোগ্য ? রামমোহন যে সময়ের ব্যক্তি সে সময়ের সঙ্গে এখনকার কি প্রভেদ আছে ? রামমোহন রায়কে কি স্ত্রী কি পুরুষ কখনও কি নিন্দা করিতে পারিবে ? যদি না পারে সে গুণটি কি ? রাজা রামমোহন রায় কোন্ দেশীয় মনুষ্য ? ইনি তিব্বতে যাত্রা করিয়াছিলেন কেন ? সে দেশ কোন্ মহাখণ্ডের অন্তর্গত ? সে দেশের ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার কোন সম্পর্ক আছে কিনা ? তিব্বতীয় জাতি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ? রামমোহন কোন্ রাজার পুত্র এবং কোন্ দেশীয় প্রজার শাসনকর্ত্তা ? যদি তাঁহার রাজত্বের নাম নির্দ্দেশ দুরূহ ব্যাপার হয় তবে কিরূপে তাঁহার নামে "রাজা" উপাধির কীর্ত্তন কর ? অবশ্য কোন সঙ্গত অর্থ-দ্বারা তাঁহার রাজশব্দ অক্ষুণ্ণ আছে ও থাকিবে। তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন কেন ? তথায় যে কার্য্যের জন্য গিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন কিনা ? তদীয় কীর্ত্তির মধ্যে এমন কোন কীর্ত্তির নাম নির্দ্দেশ কর যদ্দ্বারা তিনি স্ত্রীসমাজে পরম মান্য ও সকলের প্রাতঃস্মরণীয়। সে কার্য্যের সহায়তা ও সার্থকতা সম্পাদনে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন ? তৎকালীন ভারতের শাসন-কর্ত্তার নাম নির্দ্দেশ কর। তিনিও প্রশংসার পাত্র কিনা ? অন্বয় শব্দের অর্থ কি ? এখানে উহার অর্থ কি ? স্মার্ত্ত শব্দের অর্থ কি ? সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ও পরোক্ষ সম্বন্ধ, এ তিনের প্রভেদ কি ? পাশ্চাত্য অর্থ কি ? তত্রত্য, অত্রত্য, দাক্ষিণাত্য, একসূত্রে আবদ্ধ কিনা ? এবং কি অর্থে এই সমস্ত পদ হয় ? "স্থির নিশ্চয়" ইহার বিপরীত শব্দ দেখাও এবং ইহা কোন্ সমাসনিষ্পন্ন পদ ? বিতণ্ডা, বাদ ও প্রতিবাদ এ তিনের পৃথকত্ব কি ? আবাহন ও বিসর্জ্জন এই দুইয়ের অর্থ বল। অকর্ম্ম ও অপকর্ম্মের বিশেষত্ব দেখাও। মন্ত্রতন্ত্রের অর্থ কি ?

'পদ্মরাগমণির খনিতে কাচের উৎপত্তি হয় না।' রামমোহন রায়ের বিষয়ে এই মহাবাক্যের সমাধান কর।

সম্রাট্ মহম্মদ আকবর সাহ।

ভূস্বামীকে আর্য্যশাস্ত্রানুসারে অষ্টদিক্‌পালের অংশ জ্ঞান করিতে হয়। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিতে হয় না। জন্মান্তরীয় মহাতপস্যার ফলে ভূস্বামী হয়। তিনি সকলের ভক্তির পাত্র। যে রাজা সে প্রকার আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ ও স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে সদা সাবধান তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজা শব্দে অভিহিত হইতে পারেন। মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে আকবরের তুল্য শত্রুমিত্রে সমব্যবহারের রাজা কাহাকেও দেখা যায় না।

মহাত্মা আকবর সাহ খৃষ্টীয় ১৫৫৬ অব্দে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। তিনি ধার্ম্মিকচূড়ামণি, নিরপেক্ষ শাসনকর্ত্তা, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সদাশয়, পরোপকারী, জাতি-গত বা ধর্ম্মগত পক্ষপাতপরিশূন্য ব্যক্তি ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার প্রতি প্রজাপুঞ্জ ভক্তিভাবে কহিয়া থাকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। এতাদৃশ সৎস্বভাবের সম্রাট্ দেবতার ন্যায় সম্মানিত হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? তাঁহাকে সকল জাতিই অন্তরের সহিত পরমাত্মীয় মনে করিত।

তিনি ক্ষুদ্র, মহৎ ও আবালবৃদ্ধবনিতার সমান অধিগম্য, সমান অধৃষ্য এবং প্রিয় ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের সহিত সখ্যসংস্থাপনমানসে স্বীয় পুত্রের পরিণয়কার্য্য জয়পুরের

সম্রাট্ আকবর শাহ্

চারু-প্রবন্ধ

৪৪ পৃষ্ঠা

Sreenath Press Dacca

ক্ষত্রিয় রাজকন্যার সহিত সংবদ্ধ করেন। নিজেও ভগবান্ দাসের তনয়াকে সহধর্ম্মিণী করেন। তিনিই আকবরের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তাঁহারই গর্ভে সেলিমের জন্ম। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, হিন্দুমুসলমানে পরস্পর বৈরভাব না দেখায়। এই সূত্রে তিনি হিন্দুদিগের নিকটে অমায়িকতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার রাজস্ব-সচিব-পদে তোড়রমলনামক ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত একজন হিন্দুকে প্রধান অমাত্য নিযুক্ত করেন। তদীয় মন্ত্রণায় রাজস্বের অধিকাংশ প্রকৃত সৎকর্ম্মে ও প্রজা-পালনে এবং সংস্কৃত শিক্ষায় ব্যয়িত করেন। তাঁহার সভায় অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। তদীয় মন্ত্রণায় একজন মুসলমান হিন্দুবেশে ও হিন্দুর ন্যায় আচরণে হিন্দুদিগের নিকটে শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তাঁহার নাম ফৈজী। তাঁহার সভায় একজন পারস্যভাষার কবি ছিলেন। তাঁহার নামও ফৈজী। সংস্কৃতজ্ঞ ফৈজীর সাহায্যে হিন্দুদিগের দায়ভাগ গ্রন্থের সারসংগ্রহ করা হয় এবং বিচারবিষয়ক যে গ্রন্থ লিখিত হয়, তন্মধ্যে উহা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থের নাম আইন আকবরী। উহা ঐতিহাসিক অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও বটে।

আকবর সাহের অনুমতিক্রমে সংস্কৃত লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থদৃষ্টে পাটীগণিত, বীজগণিতের আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়। আকবরের সময় হইতে মুসলমানেরা গণিতবিদ্যার অভ্যাসে মনোযোগী হইয়াছেন। গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবশতঃ মনুষ্যের অদৃষ্টে শুভাশুভ ঘটে, ইহা মুসলমানগণের মনে স্থানপ্রাপ্ত হয়।

সেই হেতু মুসলমানসমাজে গ্রহনক্ষত্রাদির ভাবগতিবিষয়ক গণিত-গ্রন্থ আরবী ও পারস্য ভাষায় রচিত হয়।

ভারতের সর্ব্বত্র প্রশস্ত রাজপথ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাকের চিঠিও চলিত। যাহারা পত্র বহন করিয়া পৌঁছাইয়া দিত, তাহাদিগকে ধাউড়িয়া কহিত। ঐ ডাককে বাদসাহি ডাক বলিত। ঐ ডাকের অধীনে জমীদারী ডাক ছিল, উহা প্রত্যেক গ্রামের চৌকীদার দ্বারা যথাসময়ে জমীদারের কাছারীতে প্রেরিত হইত। ইহারও সুশৃঙ্খলা আকবর সাহ দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। এই জমীদারী ডাক সেদিন পুলীষের হাতে উঠিয়া গিয়াছে। সেদিনও জমীদারেরা ডাকপাইকের খাজানা দিয়া আসিয়াছেন। জমীদারী ডাকের গতায়াতজন্য সকল গ্রামেই চৌকীদারী নিষ্কর ভূমি ও পথ ছিল। ঐ সকল চৌকীদারী নিষ্কর ভূমি নূতন চৌকীদারী পঞ্চায়তসংস্থাপনের সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে. সেই ভূমিগুলির অর্দ্ধেক রাজস্ব এখন জমী-দারের, অর্দ্ধেক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অনাথ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র ও গুণিগণের রক্ষা ও ভরণপোষণ-নিমিত্ত তিনি ভূস্বামিবর্গকেই নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব হইতে অনেক অংশ অব্যাহতি দিতেন।

তিনি যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতাদৃষ্টে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন ; স্বজাতি বিজাতি বলিয়া কাহার প্রতি সদয় ও কাহার প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুগণ সর্ব্বতোভাবে কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী। তদ্ধেতু উচ্চতম রাজকীয় কার্য্যে অনেক হিন্দুকে নিযুক্ত করেন। ইহা

তাঁহার মনের ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া যে কার্য্যের জন্য মানবজন্ম দিয়াছেন, সেই কার্য্য না করিলে তাঁহাকে ঈশ্বরের নিকটে সাপরাধ বলিয়া দণ্ডিত হইতে হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা উচিত নহে।

যিনি এতাদৃশ মহান্ ব্যক্তি তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিলে সেদিন শুভ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। হিন্দুরা তাঁহাকে এতাদৃশ ভক্তি করিত, যাহা কথায় বলিলে চাটুকারের কথা বলিয়া বোধ হইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা নহে। তদীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা অনেকে সংগ্রহপূর্ব্বক লক্ষীর কৌটায় সংস্থাপিত করিয়া রাখেন।

তিনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। স্বয়ং সকল কার্য্যের অনুসন্ধান লইতেন। পরমুখে রসাস্বাদকে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় বলিয়া তাঁহার যথার্থ বিশ্বাস ছিল। এই কারণেই তিনি মহাযশস্বী হইয়া আছেন। তাঁহার রাজ্যশাসন কালকে রামরাজ্য অথবা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন সদৃশ বলিতে কেহ ইতস্ততঃ করে না। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে আর কি সুখ্যাতির আশা করা যাইতে পারে?

ইং ১৫৪২ খৃঃ অব্দে অমরকোটে মোগলবংশে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬০৫ খৃঃঅব্দে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদীয় রাজত্বকাল অর্দ্ধশতাব্দী। এই কালমধ্যে তিনি বহুতর ব্যাপারোপলক্ষে সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বত্রই প্রাধান্যলাভ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত

ঐতিহাসিক বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ, অধীনতার সংস্থাপনপূর্ব্বক মৈত্রীকরণ। যথা, মালব, রাজপুতানা, গুজরাট, বাঙ্গালা, কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার, ও খান্দেশ প্রদেশের ভূপতিগণের পরাক্রমের সীমা ছিল না। তাঁহারাই তাঁহার ভয়ের প্রধান হেতু ছিলেন। তাঁহারা পরাস্ত হইলেই ভারতের সমস্ত উপদ্রবশান্তি হইবে, এইরূপ বিশ্বাসে তাহাদিগের রাজ্য অগ্রে আক্রমণ করেন। তিনি সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী লোকের গুণগ্রহণপূর্ব্বক সভাসংস্থাপন করেন। সেই সভার প্রধান পারিষদ আবুল-ফাজেল, আব্দুল কাদের, ফৈজী, তোড়রমল্ল, ভগবান্ দাস, বীরবল, তানসেন প্রভৃতি গুণিগণ। আইন-আকবরী ঐতিহাসিক এবং দণ্ডনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থ। উহা আবুল ফাজেল-প্রণীত। ফৈজী সংস্কৃত হইতে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রের অনুবাদ করেন। আব্দুল কাদের শান্তিসংস্থাপনবিষয়ক ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করেন। তোড়রমল্ল রাজস্বসংক্রান্ত নিয়মনির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা লিখেন। তানসেন অদ্বিতীয় গায়ক। ভূমণ্ডলে ইহার তুল্য এপর্য্যন্ত কেহ জন্মে নাই।

আদর্শ প্রশ্ন।

সম্রাট্ মহম্মদ আকবর সাহ কোন্ দেশীয় লোক? তিনি কি জন্য সংস্কৃত ভাষা হইতে আরব্য ভাষায় গণিত, সাহিত্য ও ব্যবহারশাস্ত্র অনুবাদ করান? তৎকালে ডাকের চিঠি চলিত কি না? ভারতে প্রশস্ত রাজপথ ছিল কিনা? তাঁহার প্রতি লোকে বিশেষ ভক্তি দেখাইত কেন? তাঁহার কি এমন মনোমোহিনী শক্তি ছিল যদ্দ্বারা তিনি সমস্ত

জাতির মধ্যে বৈরভাব দূর করিয়াছিলেন? তাঁহার শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে কোন শত্রুর অভ্যুত্থান হইয়াছিল কিনা? তিনি কোন্ কোন্ রাজার সঙ্গে মৈত্রী সংস্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালের সীমা কত বৎসর? তাঁহার জন্ম যে বংশে সেই জাতীয় লোকের সাধারণ অধিবাস-স্থানের ভৌগলিক সীমা নির্দ্দেশ কর। সে দেশ হইতে ভারতে প্রবেশের পথ নির্দ্দেশ কর। সম্রাট্, ভূপতি ও রাজা এই তিন পদের ব্যুৎপত্তি সমেত প্রকৃত অর্থ লেখ। ঐরূপ পদ সহজে লাভ হয় কি? অথবা কোনরূপ তপস্যার প্রয়োজন? আকবরের মহানুভাবকতার পরিচয় কি প্রকারে জানা যায়? অধিগম্য ও অগম্য ছিলেন ইহার অর্থ কি? তোড়রমল আকবরের সভায় কিরূপ গৌরবান্বিত পদমর্য্যাদা লাভ করেন? আইন-আকবরীগ্রন্থ কি কার্য্যের উপযোগী এবং কিরূপে কাহার দ্বারা লিখিত হয়? মুসলমান জাতি কিরূপে কত কাল গণিত-বিদ্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন? তদ্বিষয়ক গ্রন্থ কোন্ দেশের মৌলিক গ্রন্থ? সেকালে রাজাবিহ কার্য্যের কোনরূপ সুশৃঙ্খলা ছিল কি না? তন্নিমিত্ত কেহ রাজকোষ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থ পাইত কিংবা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিত। সে ভূমি কি হইয়াছে? আকবর সাহেব মনে, কথায় ও কার্য্যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটিতে নিজে কতদূর ক্ষুণ্ণ বা সাপরাধ জ্ঞান করিতেন, তাহা বল। দণ্ডনীতি ও অর্থব্যবহারশাস্ত্রের লক্ষণ এবং পরস্পরের পার্থক্য দেখাও। এতাদৃশ, মহান্, ঔদার্য্য সর্ব্বত্র, গুণানুকীর্ত্তন, চাটুকারী, পরমুখে রসাস্বাদ, মৈত্রীকরণ, এই কয়েকটির ব্যুৎপত্তি ও পদপরিচয় কর এবং সমস্ত পদগুলির ব্যাসবাক্য লিখ। পরমুখে রসাস্বাদের তাৎপর্য্য লেখ। রামরাজ্য ও যুধিষ্ঠিরের শাসনের সঙ্গে তুলনা করিলে তুলিত (উপমেয়ের) বিষয়ের গুণ বা দোষ বর্ণন হয়? মহান্ ও এতাদৃশ পদের ভিন্ন লিঙ্গের পদ দেখাও।

প্রকৃত খৃষ্টিয়ান মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার।

অতি ক্ষুদ্র বীজে ও তুচ্ছস্থলে মহামহীরুহের এবং পরম-পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা, অশ্বত্থতরু। অতি মলিন এবং দুর্গন্ধময় পঙ্কে পদ্মের জন্ম। তজ্জন্যই তাহার পঙ্কজ নাম হইলেও, সৌগন্ধে সে মনমোহনকারী, উহার রূপে, মাধুর্য্যে এবং উপকারিতায় দেবতা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মনুষ্যের কথা ত সুদূরপরাহত। এখানে যেমন পদ্মের উৎপত্তিস্থানের বিষয় মানসপটে স্থান দিই না, তেমনি মহানুভব ব্যক্তির জন্ম-স্থানের অন্বেষণের প্রয়াস পাওয়াও উচিত নহে। যে ব্যক্তির মনের মহত্ত্ব এবং ঔদার্য্য আছে, তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। আরও দেখ, বিন্দুমাত্র তুচ্ছবস্তু দ্বারা ঘোরতর দুশ্চিকিৎস্য রোগ দূরীকৃত হয়। তখন উহা ঔষধ নামে পরিচিত হয়। সেই ঔষধের কণামাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় সংস্পর্শ করিলে হয়ত প্রাণনাশের সম্ভাবনা, কিন্তু রোগশান্তিপক্ষে উপকারক বলিয়া উহা অবশ্য সেব্য, গ্রহণীয়, এবং আদরের বস্তু; তুচ্ছ বিষ বলিয়া পরিত্যাজ্য নহে। সেই প্রকার মহামহিমান্বিত ব্যক্তি কিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে বিরোধিতা আছে কি না তাহার অনু-সন্ধান করা বিধেয় নহে। আজি এই প্রসঙ্গে যে মহাত্মার নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, তিনি রাজপুত্র নহেন, ধনকুবের নহেন, বিশেষ বিদ্বান্ নহেন, বাগ্মীও নহেন অথবা অতি সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূতও নহেন, সামান্য বণিগ্‌পুত্র। ইঁহার জন্মস্থান স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশ।

ডেভিড্ হেয়ার

চক্ষু-প্রবন্ধ ৫০ পৃষ্ঠা

Sreenath Pre.., Dacca

এই মহাত্মার নাম ডেভিড্ হেয়ার সাহেব। ইনি খৃঃ ১৭৭৫ অব্দে জন্মপরিগ্রহ করেন। তথায় লেখাপড়া শিখিয়া ঘড়ী-প্রস্তুতকরণব্যবসায় অবলম্বন করেন। তদুপলক্ষে ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর জাহাজে ভারতবর্ষে ১৮০০ খৃঃ অব্দে আগত হয়েন। কিছু দিন নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শেষে ভারতের ইংরাজকৃত, রাজধানী কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখানকার অধিবাসীদিগকে সভাভব্য, বিনীত, ধার্ম্মিক এবং বিশেষবুদ্ধি-সম্পন্ন দেখিয়া ইহাদিগের সহিত আনুগত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তৎকালে এদেশীয় লোকেরা বিভিন্নধর্ম্মীকে ও বিভিন্নজাতিকে ঘৃণা করিত। বিভিন্নধর্ম্মীর সঙ্গে কাহারও সংস্রব ঘটিলে তাহাকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত। অন্ততঃ সংস্পৃষ্ট আত্মীয় ব্যক্তিকে স্নান না করাইয়া তাহার সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিত না। নিতান্ত অনতিক্রমণীয় অবস্থায় উহাকে হস্তপদাদি ধৌতপুরঃসর বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছ অথবা যবনাদি জাতির সংস্পর্শজনিত অপবিত্রতার পরিহার করিতে হইত।

এরূপ অপমান ও অমর্য্যাদাসূচক অবস্থায়ও ডেভিড্ হেয়া-রের মন ক্ষুদ্রতার দিকে পরিধাবিত হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এদেশীয় লোক যখন অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও বিচারক্ষম তখন ইহাদিগের সাধারণকে রাজকীয় ভাষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে ইহারা বুঝিতে পারিবে যে, ইংরেজরাজের সঙ্গেই ইহাদিগের এখন সন্তানসম্বন্ধ জন্মিয়াছে। এই জ্ঞান হইলে ইহারা রাজপুরুষ ও রাজবংশসম্ভূত জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া

ঘৃণা করিবে না। রাজার মনোভাব প্রজার নিকটে, প্রজার মনোভাব রাজার নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকাশিত হইলে উভয় পক্ষের দুঃখশান্তির এবং সুখের সম্ভাবনা। উভয় পক্ষের ভাষা শিক্ষাই উভয় পক্ষের হিতসাধক। অপিতু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে এ পর্য্যন্ত (পঞ্চদশবর্ষমধ্যে) বিশিষ্ট উচ্চবংশীয় ভদ্রসন্তান প্রবিষ্ট হয় নাই। ইহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, কি উপায়ে উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদিগকে হস্তগত করা যায়। এ বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে, ১৮২৪ খৃঃঅব্দে কলিকাতায় সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপনকর্ত্তা এবং সংস্কৃত নাট্য গ্রন্থ সমূহের মর্ম্মানুবাদকারী (গ্রন্থের নাম হিন্দু থিয়েটার) উইলসন্ সাহেব, তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদকর্ত্তা সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ এবং অভিধান ও বিধানশাস্ত্রের অনুবাদকারী কোল্ব্রুক্ সাহেব প্রভৃতি মনীষিগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহায়তা ব্যতীত কদাপি ঐরূপ পাণ্ডিত্যের কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কারণ ভারতের ভাবৎভাষার মূল সংস্কৃত। শাস্ত্র সমূহ উহাতেই লিখিত। তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অধিকৃত। পণ্ডিতগণ দেশের মান্য, ব্যবস্থাদায়ক ও সমাজের নেতা। অতএব তাঁহাদিগের সন্তানগণকে সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইঁহারা দরিদ্র। ইংরাজী শিক্ষা অর্থব্যয় সাপেক্ষ। ইঁহাদিগের সে ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে। ইহাদিগের সন্তানগণকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিতে পারিলে, ইঁহারা সপক্ষ হইবেন এবং ম্লেচ্ছ জাতিকে ঘৃণা করিবেন না। এবং প্রকৃত পক্ষে যদি কোন ব্যক্তিরও মনে এমন বিশ্বাস জন্মে

যে, সকল ব্যক্তিই ঈশ্বরের পুত্র এবং সমমর্য্যাদাপন্ন, কেহই তুচ্ছ ও হেয় নহে, তাহা হইলেই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইল।

ডেভিড্ হেয়ার ১৮১০ খৃঃঅব্দে বাগবাজারের নন্দলালের ইংরাজী পাঠশালাকে কলুটোলায় আনিয়া প্রকৃত ইংরাজী স্কুল-রূপে পরিণত করিলেন। ইহার সমস্ত ব্যয় নিজের উপার্জ্জিত সম্পত্তি ও পৈতৃক বিত্ত দ্বারা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা স্থির করিলেন। তদীয় ইংরাজী বিদ্যালয় অবৈতনিকরূপেই চিরকাল পরিচালিত হইবে, ইহাই তাঁহার স্থিরতর সঙ্কল্প ছিল। কেবল তাহাই নহে নিঃস্ব ও নিরুপায় ছাত্রগণের ভরণপোষণবিষয়েও যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইবে। ছাত্রগণ পীড়িত হইলে প্রকৃতরূপে তাঁহার ব্যয়ে চিকিৎসিত হইবে। শিক্ষাকার্য্যের যাবতীয় ব্যয় তাঁহার অর্থেই সম্পন্ন হইবে। সুতরাং হেয়ার সাহেবের স্কুলে সদ্বংশীয় দরিদ্র সন্তানগণের সমাবেশ হইতে লাগিল।

এখন ডেভিড্ হেয়ার আপনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া সর্ব্বদা ছাত্রগণের অভাবমোচনে ও দুরবস্থাদূরীকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কাহারও পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার আবাসে উপস্থিত হইয়া রাত্রিদিনের জ্ঞানশূন্য-ভাবে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, যত্ন এবং অর্থব্যয় দ্বারা তাহার আরোগ্যলাভের চেষ্টা করিতেন। তাঁহা দ্বারা কাহারও কোন প্রকার উপকারসাধনের উপায় থাকিলে তদ্বিষয়ে কদাচ বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহার এই স্কুলের ফলোপধায়কতাদৃষ্টে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হিন্দুসমিতির প্রধান বর্গের অভিমতি অনুসারে হিন্দুকলেজনামক স্কুল সংস্থাপিত হয়।

তদ্দৃষ্টান্তে প্রথমে উহা কেবল হিন্দুসন্তানগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হয়। পরে নিয়মভঙ্গের কথা উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ হিন্দুসমিতি গৌরমোহন আঢ্যকে মাষ্টার নির্দ্দিষ্ট করিয়া আর একটি কালেজ সংস্থাপন করিলেন। সে কালেজ অতি পারিপাট্যক্রমে বহুকাল চলিয়া আসিয়াছিল। উহা হিন্দু প্রজাগণের স্বাধীন কালেজ বলিয়াই পরিগণিত ছিল। তদ্দৃষ্টে ভবানীপুরে লণ্ডন মিসনারী, কলিকাতায় চার্চ্চ মিসনারী ও স্কট্ মিসনারীদিগের কালেজসমূহ ক্রমান্বয়ে সংস্থাপিত হইয়া দেশীয় লোকের পাশ্চাত্যবিদ্যাশিক্ষার সহায় হইল।

এদেশীয় বহুতর ব্যক্তি কৃতবিদ্য হইয়া আপনাদিগের অবস্থা রাজদ্বারে জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং রাজার সঙ্গে প্রজার যে অপত্যনির্বিশেষ সম্বন্ধ তাহাও প্রকাশ করিতে এবং উভয়ের কর্ত্তব্যস্বত্ব জানাইতে পরস্পর কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহা কি অসামান্য সুখের বিষয় নহে?

প্রজাসাধারণের মনের ভাব প্রকাশ করিবার প্রধান উপায় রাজকীয় ভাষা শিক্ষা। সে ভাষায় বহু ব্যক্তির অসাধারণ জ্ঞান লাভের হেতুই ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের আন্তরিক চেষ্টা, অধ্যবসায় ও সর্ব্বস্ব ব্যয়।

এমন মহাত্মা ব্যক্তির নাম সংকীর্ত্তন করা সকলের কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহার উদ্দেশ্যে নিরন্তর ধন্যবাদ প্রদান করা বিধেয়।

তাঁহার স্কুলের নাম কিছুদিন কলুটোলা-ব্রাঞ্চ-স্কুল নামে অভিহিত হইত। অধুনা পুনর্ব্বার হেয়ার সাহেবের স্বনামেই

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার পীড়াকালে, এদেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিতেন তাঁহাদিগের অনেকেই তাঁহার সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহারা শোকতাপে আক্রান্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশজন্য তদীয় মূর্ত্তির চিত্রপ্রতিকৃতি করাইয়া লয়েন। উহাদৃষ্টে বিলাত হইতে পাষাণময় সম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঐ ব্যয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্যগণ বহন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ঐ প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজমন্দিরের চত্বরেই ছিল। অধুনা হেয়ার স্কুলের অজিরেই দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। ঐ প্রতিমূর্ত্তি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সমানীত হয়। এখন পাশ্চাত্য বিদ্যায় যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা অবশ্যই ঐ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে অভিলাষ করিতে পারেন, দেখা নিতান্তই কর্ত্তব্য। কারণ যে ব্যক্তির মনে স্বদেশ, বিদেশ, শত্রু, মিত্র, আত্মীয় ও পর বা স্তুতি, নিন্দা বলিয়া ভেদজ্ঞান ছিল না, তাঁহাকে সংসারের সকল লোকেই উদারচরিত বলিয়া আন্তরিক প্রশংসা করিবে। উদারচেতার পক্ষে বসুধার সমুদায় ব্যক্তিই তদীয় পরিজনমধ্যে গণ্য। নীচান্তঃকরণ মনুষ্যেরাই আত্মপর বলিয়া বিভিন্নতা দেখাইয়া নিজ নিজ লঘুতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার সাহেব কাহারও প্রশংসা বা নিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না। নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে সদা মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ইহাই প্রকৃত উদারচেতার লক্ষণ।

সাধারণে যাঁহার চিত্তের ঔদার্য্য দেখে তাঁহারই গুণগানে কৃতসঙ্কল্প। যাঁহার বিষয়ে সকলে ঐকমত্যপূর্ব্বক ধন্যবাদ দেয়, তিনি কি মহাপুরুষ নহেন ?

যদি মহামহিমান্বিত হইতে ইচ্ছা কর, তবে শত্রুমিত্রে সমদর্শী হও। এবং কার্য্যতঃ উহা প্রদর্শন কর।

স্যার আইজাক নিউটনের তুল্য তাঁহার কীর্ত্তি নাই বলিয়া তাঁহাকে বড়লোক বলিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না। তিনি অন্তঃকরণের উচ্চতায় মহান্ উচ্চ। ইংরাজী শিক্ষার ফলোপলব্ধি হইলে বঙ্গবাসী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার গুণগানে অবশ্যই মুগ্ধ হইবেন। তিনি ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমে কলিকাতায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিলে তাঁহাকে অমর ব্যতীত কে মরণধর্ম্মশীল সামান্য মানব মনে করিতে পারে ?

আদর্শ প্রশ্ন।

তুচ্ছস্থানেও মহাবস্তুর জন্ম হয়, অতি ক্ষুদ্র বীজে মহামহীরুহ জন্মে এবং কোন বস্তুর কণামাত্র প্রাণনাশক ও রক্ষক হয়, তদ্রূপ ভণিতায় ডেভিড্ হেয়ারের চরিত্রকথার ভূমিকা করিবার তাৎপর্য্য কি ? হেয়ার সাহেব ম্লেচ্ছ, তাঁহার সঙ্গে হিন্দুগণের সৌহার্দ্দ ও বিশ্বাস কি হেতু জন্মিল ? তৎকালে প্রকৃত পক্ষে ম্লেচ্ছ ও যবনাদির সংস্পর্শে সংস্পৃষ্ট ব্যক্তি সমাজে কি ভাবে গৃহীত হইত ? হেয়ার সাহেবের মনে কি মূল নিয়ম উদ্ভূত হয় যদ্দ্বারা তিনি লোক বশীভূত করেন ? ভূমণ্ডলের নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে ভারতের রাজধানী কলিকাতায় লোকের আনুগত্য স্বীকার করিলেন কেন ? কি প্রত্যয়ের উপর

নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের সন্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষায় নিবিষ্ট করিতে পারিবেন মনে করিয়াছিলেন? হেয়ার সাহেবের ইংরাজী স্কুল সংস্থাপনের পূর্ব্বে এ দেশে ইংরাজী ভাষা আলোচনার স্থান ছিল কি না? তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার দেদীপ্যমান প্রমাণ কি? এখনকার কৃতবিদ্যগণের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার ফলোপধায়কা ক্রিয়া কি? ইঁহাকে আমরা মহামহিমান্বিত ব্যক্তি বলিতে পারি কি না? তাহার প্রমাণ দেও। তিনি কোন্ দেশীয় মনুষ্য? সে দেশের ভৌগলিক সংস্থান বল। তিনি কেন ভারতে আসিয়াছিলেন? তাঁহার দ্বারা ইংরাজজাতির ও ভারতসন্তানের কি উপকার সংসাধিত হইয়াছে? তাঁহাকে প্রথমতঃ হিন্দুরা ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য ও অশুচী জ্ঞান করিত, শেষে তাঁহার আনুগত্য করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি যে মাহাত্ম্যে লোকের মন আকর্ষণ করেন তাহার নামোল্লেখ কর। ডেভিড্ হেয়ারকে লোকে চিরকাল কি ভাবে দেখিবে? তৎকালে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি কি ব্যবসায় করিতেন? 'সুদূর পরাহত' ও 'দুরতিক্রমণীয়'—সমাস ও ব্যাসবাক্য বল। 'রাজকীয়ভাষা' বলিলে কাহার ভাষা বুঝিতে হইবে? তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশীয় লোক কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিল? জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কিছু আছে কি না? মহামহীরুহ, সৌগন্ধ, মনোমোহিনী, মাধুর্য্য, সুদূরপরাহত, সেব্য, বাগ্মী, অস্পৃশ্য, অনতিক্রমণীয়, বস্ত্রান্তর, রাষ্ট্রীয়ভাষা, কৃতকার্য্য, সহায়তা, পাশ্চাত্যবিদ্যা, অসামান্য, মৃত্যু, প্রতিমূর্ত্তি, বসুধা, তদীয় ও লঘুতা এই পদগুলির ব্যুৎপত্তি বা প্রকৃত অর্থ লেখ এবং সমস্তপদগুলির সমাস ও ব্যাসবাক্য লেখ।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিতান্ত দুঃখী ব্রাহ্মণসন্তান। ইঁহার পিতার নাম ৺ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়। নিবাস বীরসিংহ গ্রাম, জিলা মেদিনীপুর। মহকুমা ঘাঁটাল *। সন ১২২৭ সালের (১৮২০ খৃঃ অব্দ) আশ্বিন মাসে জন্ম। তাঁহার জন্ম-সময়ে তৌর্য্যত্রিকের কিছুই হয় নাই সত্য, কিন্তু পাঁচ জন প্রতি-বেশীর পুরন্ধ্রী যে হুলাহুলীধ্বনির সঙ্গে শঙ্খের নিনাদ করিয়াছিলেন তাহাই জগদ্ব্যাপক হইয়াছে। ঐ ধ্বনি যেন বলিল, তোমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয় এবং তুমি যেন লোক-সমাজে আদর্শ পুরুষ হইয়া লোকের ভক্তির পাত্র হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাক।

ইঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় সামান্য বেতনের একজন মুহুরী (অর্থাৎ একজন জমীদারের বাটীর সরকার) ছিলেন। ইঁহার ভদ্রতায়, সৌজন্যে ও সত্যনিষ্ঠায় ইঁহার প্রভু ও তাঁহার পরিজনবর্গ ইঁহার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন। এই ভরসায় দশ বৎসরের শিশু সন্তানকে কলিকাতার নিজের বাসায় রাখিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা তৎকালে অতি অপবিত্র ও সমস্ত পীড়ার আধার ছিল। আমাশয়, অজীর্ণতাজন্য যাবতীয় রোগ, বিসূচিকা (ওলাউঠা) ও বসন্তরোগ

---

* আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সমানীত সাবর্ণি গোত্রীয় বেদগর্ভের পুত্র বেদপ্রচার জন্য রাজদত্ত যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তররূপ স্থান প্রাপ্ত হয়েন তাহার নাম ঘণ্টাল গ্রাম। তাহার অপভ্রংশে ঘাঁটাল হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর

চারু-প্রবন্ধ ৫৮ পৃষ্ঠা।

Sreenath Press, Da

প্রবলরূপে সকল পল্লীতেই আবির্ভূত হইত। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং প্রতিভা সমবয়স্ক বালকসমূহ হইতে প্রশংসনীয় ছিল। তিনি শৈশবেই ঈঙ্গিতজ্ঞ ও কৌতুক-প্রিয় ছিলেন বলিয়া, তাঁহার জননীর সঙ্গিনীমাত্রেই তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইতেন এবং সুমধুর কথা শুনিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দশম বর্ষের পূর্ব্বেই গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষোপ-যোগী সমস্ত বিষয় সম্যক্ প্রকারে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সমপাঠীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্যরূপেই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। এখন ঠাকুরদাসের ইচ্ছা পুত্রটিকে রাজভাষাশিক্ষায় প্রবিষ্ট করিয়া দেন। উহা তৎকালের অর্থকরী বিদ্যা হইলেও শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহা হইতে পিতার সঙ্গে পদব্রজে হাবড়ায় আসিতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের প্রশস্ত রাজপথে * মাইলসূচক ইংরাজী অঙ্কের একাদিক্রমে দশটি অঙ্কের প্রতিকৃতি দেখিয়া উহা নিজেই শিক্ষা করেন।

কলিকাতার বাসায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতাকে তাঁহার একজন সঙ্গী ইংরাজী অঙ্কের হিসাবের কাগজ ঠিক দিতে দেন। ঐ উভয়ের অঙ্কগণনার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র কহিলেন "আপনারা ভুল করিতেছেন, আপনাদিগের এখন মন স্থির নাই। আমাকে কাগজ দিউন, আমি নির্ভুল ঠিক করিয়া দিব।" উঁহারা কহিলেন, "তুমি ইংরাজী জান না,

* কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত যাইবার পথ আকবর সাহের জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কেমন করিয়া ঠিক দিবে।” ঈশ্বরচন্দ্র কহিলেন, “আমি পথে আসিবার সময় ইংরাজী অঙ্কের ভাবভঙ্গি শিখিয়াছি।” পিতৃবন্ধু কহিলেন, “এ যে বাঁকা অঙ্ক, সে যে সোজা।” ঈশ্বরচন্দ্র কহিলেন, “আমি সোজা করিয়া লইব।” পিতৃবন্ধু কহিলেন, “আচ্ছা বাবা, তোমার স্পর্দ্ধা কতদূর দেখা যাউক। এই কাগজ লও।’ ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষণকালমধ্যেই নিঃসংশয়ে যথার্থরূপে ঠিক দিয়া দিলেন। ঠাকুরদাসের প্রভু এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, এই বালককে সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিউন। তথায় বেতন দিতে হয় না। জাতীয় ভাষাও শিক্ষা হইবে এবং আনুষঙ্গিক অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যাও শিখিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন এবং পরিজনবর্গের নিকটে ইঁহাকে লইয়া গিয়া কত সমাদর, কত সুখ্যাতি ও কত আশীর্ব্বাদ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া, দশবর্ষ মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি,বেদান্ত এবং অঙ্কশাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থাধ্যয়ন শেষ করিলেন। এই সঙ্গে ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি সকল শ্রেণীতেই সকল বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সকল শিক্ষকের প্রিয় শিষ্য বলিয়া শিক্ষা-সমিতির নিকটে “বিদ্যাসাগর” এই শ্রেষ্ঠ উপাধি পান। ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় পাক করিতে হইত, নিজহস্তে বাসনমাজা প্রভৃতি দাসদাসীর কার্য্যও সম্পন্ন করিতে হইত। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয়কেও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কাহারও কোন পীড়া

হইলে, তাহারও সেবাশুশ্রূষা করিতেন। অতি ভয়ঙ্কর ওলাউঠা ও বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচর্য্যা করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। বরং উৎসাহসহকারে তাহাকে শুশ্রূষা করিতেন। তাহার স্বাস্থ্যলাভে আপনার মানবজন্ম সার্থক জ্ঞান করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এখন গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্যাসাগর-উপাধিতে সম্মানিত হইলেন। সুতরাং আমরা এখন আর নাম নির্দ্দেশ করিব না। বিদ্যাসাগর বলিয়া যাহা বলিবার তাহা বলিব। পাঠকগণ দেখিবেন, তিনি ভূমণ্ডলে কেবল বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত নহেন। তিনি দয়ার সাগর, বুদ্ধির সাগর ও অসীম তেজের বাড়বানলরূপে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এরূপ হইলেও তিনি দুঃখী ব্যক্তির সর্ব্বংসহা ধরার তুল্য অভিগম্য ছিলেন। কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিসে তাহার ক্লেশের শান্তি করিবেন তাহারই চেষ্টায় একান্ত ব্যগ্র থাকিতেন। পরমেশ্বর সেই জন্য তাঁহার যৌবনের প্রথম উদ্যমেই তাঁহাকে তৎকালের উচ্চ আয় পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি হিন্দীভাষায় বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থদৃষ্টে বঙ্গভাষায় গদ্যকাব্যস্বরূপ বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমতঃ ঐ গ্রন্থ ঐ কালেজের সিবিলিয়ান ছাত্রগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার মূল পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। বস্তুতঃ উহার ভাষা দ্বারাই বাঙ্গালা সাধুভাষার রচনাপথ সুপরিষ্কৃত হইয়া আইসে। এমন কি বিদ্যাসাগরের লিখন-প্রণালী আদর্শ করিয়াই তাৎকালিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সজীবতা জন্মে। ঐ

সময়ে বিদ্যাসাগরের পরমবন্ধু ও সমাধ্যায়ী কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গালা ভাষার প্রথম শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। তদীয় শিশুশিক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ পুস্তক দ্বারা বালক ও বালিকাগণ পরমানন্দে প্রথম শিক্ষায় মনোনিবেশ করিত। ইনি এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য-শাস্ত্রা-ধ্যাপকপদে নিযুক্ত ছিলেন। যখন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুর্সিদা-বাদের জজ-পণ্ডিতের পদে মনোনীত হয়েন, তৎকালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে সংস্থাপন করার প্রস্তাব হয়; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমতঃ ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হয়েন, পরে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পাইবেন এইরূপ প্রস্তাবে সাহিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে স্বীকৃত হয়েন। অত্যল্প-কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজেরই অধ্যক্ষ হইলেন।

এখন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের বীজসমূহ অঙ্কুরিত ও ফল-পুষ্পে পরিশোভিত হইতে লাগিল। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষায় স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিত। বিদ্যাসাগরের নিয়মে সমস্ত ছাত্রকেই অবাধে নিয়মিতরূপে ইংরাজী শিক্ষা করিতে হইত নচেৎ বৃত্তি পাইবার আশা থাকিত না। ঐ সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইল। তন্নিমিত্তই অন্যান্য কৃতবিদ্যগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হয়। তাঁহারও সহায়তাকার্য্যে বিদ্যাসাগরের নাম নির্দ্দেশ করিয়াই ঐ সকল গ্রন্থকারগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর

মহাশয় ভাষার পরিমার্জ্জন না করিলে ঐ সকল গ্রন্থের রচনা প্রাঞ্জল ও সুসৌষ্ঠবান্বিত হইত না।

এই সময় খৃঃ ১৮৫৫ অব্দ। এই সময়ে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোনিবেশ হইয়াছিল। সর্ব্বত্র দেশীয় ভাষায় শিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার প্রচারজন্য একান্ত ব্যগ্রতা দেখা যাইতে-ছিল। বাঙ্গালাদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ-রচনাজন্য বাঙ্গালাভাষার সাহিত্য-সমিতি হইল। উহার সহায়তায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ প্রণীত, সঙ্কলিত এবং অনুবাদিত হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবন-চরিত, কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যান-মঞ্জরী, রাজকৃষ্ণ বাবুর নীতিবোধ, অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তিন ভাগ রচিত হয়। শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতির বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হয়। এ সমস্তেরই রচনাপ্রণালীর সুগমতা ও সৌষ্ঠব সম্পাদনে পরম্পরাসম্বন্ধেই হউক অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক বিদ্যাসাগর পথপ্রদর্শক। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতা দূরীকরণনিমিত্ত বঙ্গভাষায় উপক্রমণিকানামক ব্যাকরণ রচনা করেন। এবং সংস্কৃতশিক্ষাপথে প্রবেশ করিবার উপায়-স্বরূপ রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশাদি গ্রন্থ হইতে সহজ রচনা নিষ্কাশনপূর্ব্বক ঋজুপাঠনামক তিন ভাগ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাহাতেই সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষার পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুপরিষ্কৃত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার জন্য বঙ্গভাষায় কৌমুদীর সারাংশ সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থ শব্দ, ধাতু, কৃদন্ত ও সমাসাদি চারি ভাগে সমাপ্ত।

মদনমোহনের শিশুশিক্ষা ছন্দোবন্ধে থাকায় বালকবালিকাগণ অনায়াসে মুখস্থ করিয়া ফেলে, অথচ ঐ সকল অভ্যস্ত বিষয়ের বর্ণপরিচয় করিতে সকল সময়ে সকল বালকবালিকা সমর্থ হয় না বলিয়া, বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়নামক প্রথম শিক্ষাপদ্ধতিপ্রণয়ন করেন। ইহাতেই শিক্ষাসমাজের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয়। তদ্দৃষ্টে শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতার সঙ্গে আদর্শ বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (ইন্‌স্পেক্টার) পদে নিযুক্ত করেন। তিনি নদীয়া, বৰ্দ্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর এই চারি জিলার তত্ত্বাবধানকার্য্যমাত্র স্বীকার করেন। তাহাতে তাঁহার বেতন মাসিক সাত শত টাকা হইয়াছিল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে মহাত্মা বেথুন সাহেব কলিকাতার বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। কাদম্বরীপ্রণেতা তারাশঙ্কর তর্করত্ন স্ত্রীশিক্ষার গ্রন্থ রচনা করেন।

সে যাহা হউক বিদ্যাসাগর পরোপকারিতায়, দানশীলতায়, দরিদ্র জনের দুঃখদূরীকরণে, অনুগতজনের অভাবমোচনে এবং অনাথরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হওয়াতে একান্ত ঋণী হইলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার পুস্তকের আয় দ্বারা তিনি শীঘ্রই ঋণপাপ হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার পুস্তকের বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। এতাদৃশ আয় সত্ত্বেও তিনি সামান্য ধুতি চাদর ও চটী জুতামাত্র ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সমুদয় অর্থই পরোপকারে ব্যয়িত হইত। তিনি গুরুজনভক্ত এবং মাতাপিতার একান্ত বশবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাদিগের শুশ্রূষার জন্য

সর্ব্বপ্রকার দাস্যবৃত্তিই করিয়াছেন। তাঁহারা সুখী হইবেন বলিয়া পঠদ্দশায় অনুজগণের মলমূত্র পরিষ্কার করিতে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন নাই। পরিজনবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদননিমিত্ত নিজের সুখস্বচ্ছন্দতাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর ও বাহির পবিত্র ছিল। তিনি সত্যনিষ্ঠায় একজন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নামস্মরণে পুণ্য জন্মে।

বিদ্যাসাগর নিরহঙ্কার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়শালী, পরিশ্রমী, সত্যবাদী, পরম দয়ালু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সরলান্তঃকরণ, কার্য্যকুশল এবং দাতৃত্বগুণে অতি মহান্ ছিলেন বলিয়াই ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় সম্মানাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন।

যে মহাত্মার এত গুণ তিনি স্বকীয় পরিচ্ছদ অথবা যানবাহনের পারিপাট্যবিষয়ে অর্থ ব্যয় করিতেন না। সামান্য স্থূল ধৌত বসন পরিধান করিয়া পরম পরিতুষ্ট থাকিতেন। এমন কি যখন সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ এবং স্কুলসমূহের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তখনও জন্মভূমি ও জনকজননীর দর্শনজন্য কলিকাতা হইতে বীরসিংহা গ্রামে পদব্রজে আসিতেন। দাসগণ সঙ্গে থাকিলেও কাহাকে কষ্টানুভব করিতে দিতেন না। কেহ পথিমধ্যে ভারবহনে ক্লান্ত হইলে সাধ্যমত তাহার ভারবহন করিয়া তাহার শ্রান্তি দূর করিয়া সুখী হইতেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত এরূপ অসদৃশ ব্যবহার মহোদয়ের পক্ষে শোভা পায় না, তাহার উত্তরে বিদ্যাসাগর কহিতেন, পরোপকার এবং পরের দুঃখ দূর করিবার জন্যই জগদীশ্বর তাঁহাকে অভিমানশূন্য করিয়াছেন।

উত্তর শুনিয়া লোকে অবাক্ এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সহস্র ধন্যবাদ করিত।

বিদ্যাসাগর স্বকীয় জন্মভূমিতে অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয় করিয়া দিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের প্রতি-পালনজন্য বিদ্যাসাগরের মাতাপিতা ও পরিজনবর্গ একান্ত উৎসাহের সহিত অন্নাচ্ছাদনবিতরণে পরমানন্দিত হইতেন।

বিদ্যাসাগরের বাসায় অতিথি-অভ্যাগত, আত্মীয়গণ, ভ্রাতৃবর্গ এবং ছাত্রবর্গ সমান ভাবেই আহার পাইতেন। আত্মীয়, কুটুম্ব, ও নিঃসম্বন্ধ ব্যক্তি বলিয়া ভোজনপ্রাপ্তির কোন ইতর বিশেষ ছিল না। দিবারাত্রমধ্যে শতাধিক লোক আহার করিত। বিদ্যাসাগর কত ছাত্রকে অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক ও স্কুলকালেজের বেতন দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

তিনি কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের জ্ঞানোন্নতিসাধনেও কৃত-সঙ্কল্প হইয়া নৈশ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

কোনপ্রকার শুভ সাধনের প্রস্তাব হইলেই তাহাতে তিনি কেবল বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। কার্য্যতঃ তাহাতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন।

ছাত্রগণ, তোমরা ইঁহার বিষয় যাহার নিকটে যত শুনিবে ততই তোমাদিগের আনন্দ জন্মিবে। সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

তাঁহার সহিত যাঁহার পরিচয় ছিল, তিনিই তাঁহার স্তুতি ও প্রশংসা না করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে পারিতেন না। রসজ্ঞ ও ভাবুক ব্যক্তিবর্গও তাঁহার রসিকতায় মোহিত হইতেন। দুঃখী

ব্যক্তিরা সহস্র বদনে সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিত। ইহা অপেক্ষা ইহজগতে মনুষ্যের পক্ষে আর সৌভাগ্যের কথা কি হইতে পারে।

১৮২০ খৃঃ অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের শেষে মৃত্যু।

আদর্শ প্রশ্ন।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশের ভূমিকায় বা বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ দেখা যায়, তাহার কারণ কি? প্রাঞ্জল ও সুসৌষ্ঠবান্বিত পদের অর্থ কি? কোন্ সময়ে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভারতবাসীর প্রতি শুভদৃষ্টি পতিত হয়? বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক গ্রন্থকারগণের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম নির্দ্দেশ কর। বিদ্যাসাগর কি গুণে সাধারণের প্রিয়, মান্য ও প্রাতঃ-স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন? বিদ্যাসাগরের চরিত্রকথা পাঠ করিলে ছাত্রগণের মনে কোন সাধুভাব জন্মে কি না? তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পারিলে ছাত্রগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে কি না?

আশ্চর্য্য দর্শন।

আমরা যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সর্ব্বত্র সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের অদ্ভুতকীর্ত্তি দেখিতে পাই। যদি ঐ সকলের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করি তাহা হইলে অভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতে পারি। তদীয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেখিলে কে না চমৎকৃত হয়? যদি মনুষ্যকৃত ইন্দ্রজাল দেখিয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিও বিস্ময়াপন্ন হয়েন, তবে পরমেশ্বরের রচনাপ্রণালী দেখিয়া যে অদ্ভুতরসের সাগরে নিমগ্ন না হইবেন ইহা কখনই বলা যায় না। মনুষ্যকৃত আশ্চর্য্য পদার্থের সংঘটন ঐশ্বরিক সামগ্রীর অনুকৃতিমাত্র। অনুকৃতির দর্শনে যদি মোহ জন্মে তবে প্রকৃতপদার্থঘটনার পরিদর্শন করিলে অবশ্যই সকলকেই চমৎকৃত হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের গুণগানে মনকে ব্যাপৃত করিতে হইবে।

সামান্য কীট হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাঁহারই অসীম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাইবে। মধুমক্ষিকার মধুচক্র এবং উহার মধুসংগ্রহ দেখিয়া কি বোধ হয়? পুত্তিকার বাসগৃহ এবং বাবুই পক্ষীর বাসা নিরীক্ষণ কর, তাঁহারই শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইবে। তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালীতে ঈশ্বরের নিয়ম অনুভূত হইবে। পশু পক্ষী প্রভৃতির রূপলাবণ্য পর্য্যবেক্ষণ কর, কীদৃশ অপূর্ব্বসৌন্দর্য্য অনুভব করিবে, তাহা বলা যায় না।

নদ, নদী, সাগর, উপসাগর, পর্ব্বত, কানন ও আকাশের দিকে নয়ন উন্মীলন করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রাদির ভাবগতির বৈচিত্র্য দেখিয়া অশেষপ্রকার আনন্দ অনুভব

চারুপ্রবন্ধ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। ৬৯ পৃষ্ঠা।

Sreenath Press Dacca.

করিতে পারা যায়। যিনি হিমগিরির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি ভূমণ্ডলের দৃশ্য অবলোকন করিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দপরম্পরায় নানাবিধ রসাস্বাদন করিয়া হৃদয়ের ও নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। যিনি সমুদ্রের অগাধতা ও অসীম বিস্তার এবং উত্তাল তরঙ্গমালামধ্যে মুক্তার সঙ্কলনজন্য মনুষ্যকে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি কি প্রথমে ঐ ব্যক্তির প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা করেন নাই? কিন্তু যখন তাহাকে রত্নাকরের উদর হইতে রত্নসংগ্রহ করিয়া আনিতে সমর্থ দেখিয়াছেন তৎকালে হিংস্র জলজন্তুর কথা তাঁহার মনে আইসে নাই। অন্যপক্ষে জলজন্তুর শোভাসৌন্দর্য্য এবং প্রকৃতি দেখিয়া পরম-আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

নায়াগারা ও ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত অতি অদ্ভুত ব্যাপার। সমুদ্রের বাড়বানল এবং কোন কোন পর্ব্বতশিখরের অগ্ন্যুৎপাত (এট্না ও বিসুভিয়াস প্রভৃতির অগ্ন্যুদ্গার) অতি ভয়ানক। উহা ভয়প্রদ হইলেও কাহার না দেখিতে ইচ্ছা জন্মে? প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে ভীষণ পদার্থ থাকিলেও দর্শনের অভিলাষ জন্মে। যথা চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সীতাকুণ্ড ও মুঙ্গেরের জ্বালামুখী প্রজ্বলিত হইতেছে, পুষ্প, ফল, পত্রাদি দহন করিতেছে, কিন্তু শৈত্যগুণে অনায়াসে তাহা স্পর্শ করা যায়, ইত্যাদি পরমাশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিয়া কে না বিস্ময়াবিষ্ট হয় এবং পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার আরাধনায় মনোনিবেশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে। ভূমণ্ডল ভ্রমণ কর, সর্ব্বত্র তাঁহার অপার ও অতর্কিত মহিমা দেখিতে পাইবে।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা যে বিভিন্ন হইয়াছে, সে কেবল হিমালয় ও বিন্ধ্যনামক দুই গিরিরাজ ও রত্নাকর দ্বারা। হিমালয়পর্ব্বত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রতি নিরীক্ষণ কর, কি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া লোমাঞ্চিততনু হইবে। গদগদ বচনে ঈশ্বরের অতুল মহিমার গুণগান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। আর্য্যাবর্ত্তে যাহা নাই তাহা কুত্রাপি নাই এবং এই স্থানই ভারতের সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের নিদানভূত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগকে দাক্ষিণাত্য কহে। উহাকে পঞ্চ দ্রাবিড়ও কহে। উহার আচারব্যবহার, সৌন্দর্য্যাদি যাহা কিছু আছে সমস্তই আর্য্যাবর্ত্তের অনুকৃতিমাত্র। তবে গোলকুণ্ডায় হীরক ও দক্ষিণ সমুদ্রে মুক্তার সম্ভাব হইলেও দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যে কত রত্ন আছে কে তাহার সন্ধান লয়। হিমালয়ের তুল্য উচ্চ পর্ব্বত ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় দেখা যায় না। খাইবারপাশ ও বোলানপাশনামক গিরিসঙ্কট ব্যতীত অন্যত্র প্রবেশ ও নির্গমের আর সহজ পথ নাই। উহার দৃশ্য অতি ভীষণ ও অপূর্ব্ব।

আবার বৃক্ষলতা, গুল্মগুচ্ছ ও শস্যাদির পত্র, পুষ্প, ফলাদির আকৃতি প্রকৃতি এবং সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি যথার্থরূপে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ব্যক্তি কি ঈশ্বরে প্রেম না করিয়া পাষাণবৎ জড় হইয়া নিস্তব্ধ থাকিতে পারে?

যখন আমরা শস্যপূর্ণ শ্যামলক্ষেত্র ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত উদ্যানরাজি নিরীক্ষণ করি তখন মানসপটে প্রকৃতির কতপ্রকার

ছবি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হই। দ্রব্যাদির ষড়্রসের আস্বাদনে রসনার তৃপ্তিসাধন ও শরীরের পুষ্টি করিবে বলিয়া তৎপ্রাপ্তিতে সুখ ও অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখ জ্ঞান করিয়া কত প্রকারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও নিগ্রহরূপ বাক্যের প্রশ্ন করিয়া থাকি।

খনিজ পদার্থ, গুল্মগুচ্ছ এবং বৃক্ষলতাদির মধ্যে ভেষজের গুণ দেখিয়া কৃতার্থ হই। খনিজ দ্রব্যের বিচিত্রতা ও প্রয়োজনীয়তা দৃষ্টে ঈশ্বরের অপার করুণার বিষয় চিন্তা করিয়া মন স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।—স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, লৌহাদি ধাতু, পাথুরিয়া কয়লা ও কেরাসিনাদি তৈলভাবাপন্ন স্নেহময় দ্রব্য কোন্ ব্যক্তির নিকটে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে ?

আবার যদি কোন স্থানে না যাইয়া ও কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি বিক্ষেপ না করিয়া কেবল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি তাহা হইলেও ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, হোরা, প্রহর, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, সায়াহ্ণ, সন্ধ্যা, উষা, দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ, প্রভৃতির উপাধির গণনার ফলপ্রসূত দ্রব্যের উদ্গম, নিগম, স্থিতি, উপকারিতা ও অপকারিতা শ্রবণে ও দৃষ্টে জগন্নির্ম্মাতার নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারি না।

এই ত প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থার নামোল্লেখমাত্র করিয়া নিরস্ত হইলাম। কেবল যদি একজাতীয় পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও সমস্ত নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইব না। সেই হেতু মনুষ্যের কৃতিসাধ্য প্রত্যক্ষ বস্তুর দুই একটির নাম নির্দ্দেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিব।

কলিকাতার যাদুঘর (মিউজিয়াম) দেখ, এস্থানে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের না হউক অনেক দ্রব্যের সমাবেশ করা আছে। উহা প্রত্যক্ষ কর। তোমাদিগের আনন্দসাগর উদ্বেল হইবে। মেডিকেল কালেজের মৃত জীবের তাদৃশ অবস্থাপন্ন ভাব দেখিয়া কে না বিস্ময়াবিষ্ট হয়? আলিপুরের জীব-প্রদর্শনাশ্রমের জীবিত প্রাণিসমূহের রঙ্গ দেখ। শ্রীক্ষেত্রের ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরনির্ম্মাণের নৈপুণ্য দেখিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবে। সমুদ্রগর্ভে দ্বারকার মন্দির অবলোকন করিয়া অপরিমিত হর্ষলাভ করিবে না কি? আগরার তাজমহলনামক সৌধ এবং দিল্লীর জুমা মস্‌জিদ পরিদর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি পরিতোষ লাভ না করেন।

কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, হায়দারাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, দিল্লী, এলাহাবাদ, কানপুর, পুনা, জয়পুর, লাহোর অমৃতসর প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের শোভা সন্দর্শন করিলে আধুনিক শিল্পীদিগের কারুকার্য্যের সঙ্গে তারতম্যে প্রাচীন কালের শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়। অপিচ উচ্চশ্রেণীর বিপণীসমূহে প্রবেশ করিলে ভূমণ্ডলের তাবৎ বস্তুর দর্শন লাভ করা যায়। এবং কোন্ দেশে কি কি পদার্থ আছে বা নাই তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

চীনদেশের পূর্ব্বতন প্রাচীর পৃথিবীতে এক অতুলনীয় বস্তু ও দৃশ্য পদার্থ। উহার বিস্তার ৫০ মাইল। এবং দুইশত বৎসর পরিমিত কাল হইতেও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রখ্যাত।

ইজিপ্টের পিরামিড একটি দর্শনযোগ্য বস্তু। উহা কত
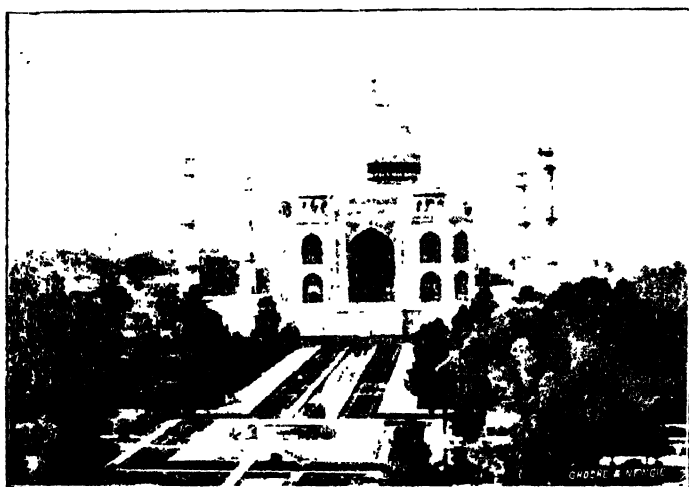
তাজমহল (আগ্রা)
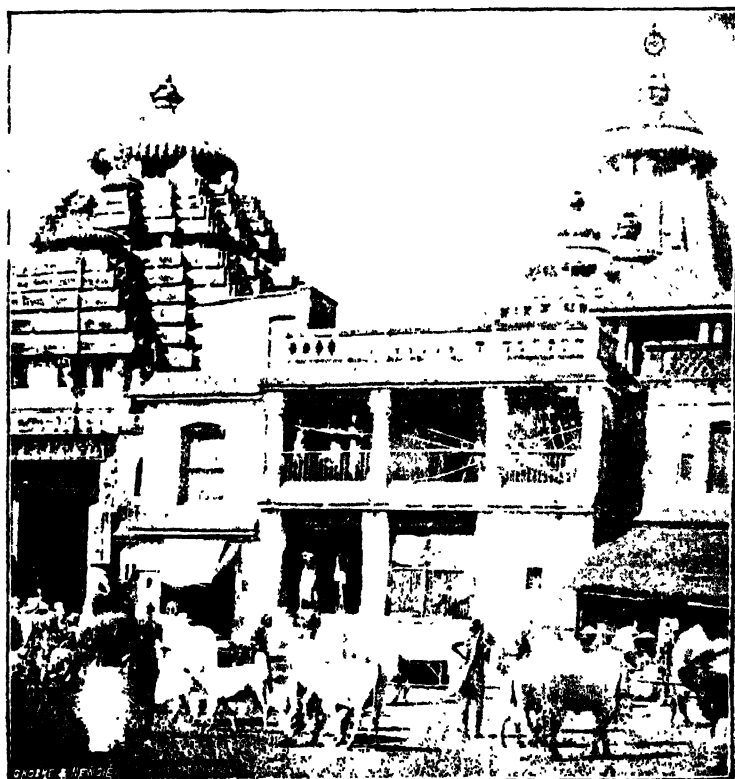
চারু-প্রবন্ধ

৭২ পৃষ্ঠা।

Sreenath Press, Dacca.

জগন্নাথের মন্দির

চারু-প্রবন্ধ — ৭২ পৃষ্ঠা।

Sreenath Press, Dt

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

Sreenath Press, Dacca
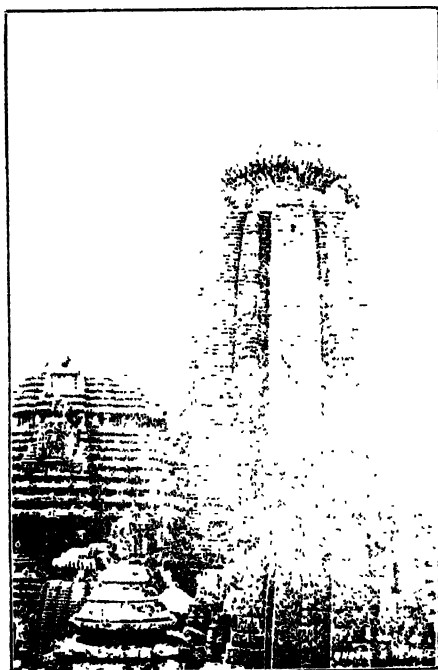
কালের তাহা কেহ কহিতে সমর্থ হয়েন না। ঐ সকল স্তম্ভ অতি উচ্চ এবং সুবিস্তৃত। অবিনশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রোড্‌স ও সাইপ্রস দ্বীপের পিত্তলের ভীম মূর্ত্তি কে নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বিনির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ মূর্ত্তির পাদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শূন্যভাগ ব্যতীত অর্ণব-যানের গতি অন্যদিকে হইবার উপায় নাই। দেখ কি আশ্চর্য্য-জনক দৃশ্য।

আদর্শ প্রশ্ন।

কোন্ দেশে কি কি অদ্ভুত পদার্থ দেখিতে পাইবে? তাহার ভৌগলিক ইতিবৃত্ত বর্ণনপূর্ব্বক প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নাম নির্দ্দেশ কর। নায়াগারা, এট্‌না, বিসুভিয়াস্, চন্দ্রনাথ, বিন্ধ্য, হিমালয়, ভূমধ্যসাগর, আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য, এইগুলির ভৌগলিক সংস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণন কর। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির বিষয়ে কিঞ্চিৎ চমৎকারিত্ব ও মনুষ্যের উপকারকতা ও অনিষ্টকারিতার উল্লেখ পুরঃসর রূপসৌন্দর্য্য বা অরুচির লক্ষণ নির্দ্দেশ কর। চীন, আগ্রা, রোড্‌স্, সাইপ্রাস্, শ্রীক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর, তাজমহাল প্রভৃতির অপূর্ব্ব দৃশ্য কি তাহা বর্ণন কর। ভৌগলিক সংস্থান বল। উহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বলিতে পার কি? বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি কি দেখিয়া আমরা ভক্তিমান্ হই এবং গদগদ ভাবে তাঁহার স্তুতিগানে প্রফুল্লচিত্ত থাকি? প্রাকৃতিক অদ্ভুত ঘটনাবলীর যে কথা এই প্রবন্ধে পাঠ করিয়াছ তাহার নাম নির্দ্দেশ কর। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের আচার-ব্যবহার ও ভাষা একপ্রকার না হইবার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কি? কোন্ প্রদেশের আচারব্যবহার প্রাচীন? জীবগণের শ্রেণীবিভাগ কর। উদ্ভিদ্ পদার্থের সৃষ্টিতে আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের কোন

বিশেষ অনুগ্রহ দেখিতে পাই কি না? সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম, অভূতপূর্ব্ব, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, উন্মীলন, শিল্পনৈপুণ্য, অশ্রুদ্‌গার, বিস্ময়াবিষ্ট, লোমাঞ্চিততনু, তূষ্ণীম্ভাব ও অবিনশ্বর এই কয়েকটি পদের ব্যুৎপত্তি, সমাস এবং প্রতিশব্দ লেখ। ভেষজ, ঔষধ এবং ওষধি শব্দের পৃথকত্ব লিখ। উদ্গম, নিগম, স্থিতি এই তিনের সরলার্থ বল।

দাতা ও পরোপকারক মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

ভারতীয় আর্য্যজাতির দাতাকর্ণের কথা শুনিলে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। উহা অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সে ঘটনার উল্লেখ না করাই কর্ত্তব্য। কারণ তাদৃশ দৈবভাবসম্পন্ন কার্য্যকলাপের তুলনায় লৌকিক ক্রিয়ার কোন অংশেই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। অতএব লৌকিক মনস্বিতা, উদারতা, দয়ালুতা, বদান্যতা এবং পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের একাধারে বিদ্যমানতার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই মূল উদ্দেশ্য। তাহা দেখাইতে পারিলে ছাত্রগণ বুঝিতে পারিবে যে, একাধারে নানাপ্রকার সদ্‌গুণ থাকা অসম্ভব নহে। তেমন লোক মনুষ্যসমাজের শিরোমণিস্বরূপ। যে ব্যক্তি মানবপ্রকৃতির আদর্শ পুরুষ তাঁহার গুণকীর্ত্তনে মন প্রফুল্ল হয়। এবং যদি তদীয় কার্য্যসমূহের কোন একটির অনুকরণ করিয়া নরজাতির উপকারসাধন সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহা করা সকলের পক্ষেই সহজ এবং সুসঙ্গত। কার্য্যতঃ

লোকসমাজের হিতসাধন হইলে অন্তঃকরণে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

এই কথাগুলি যে প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইল তাহা কথায় বলা অপেক্ষা একটি প্রামাণিক নিদর্শন দ্বারা প্রকাশ করাই শ্রেয়স্কর। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দমধ্যে ইংলণ্ড প্রদেশে যে লোক-রঞ্জনকারী, পরোপকারী ও লোকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখহারী মহাত্মা বর্ত্তমান থাকিয়া ভূমণ্ডলে অতুল কীর্ত্তিবিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম জন হাওয়ার্ড।

হাওয়ার্ড ইংলণ্ড দেশের অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনীর সন্তান। তাঁহার অন্তঃকরণ অশেষ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিল। সকল জাতির শাস্ত্রেই বলে, দয়ার সমান ধর্ম্ম নাই। পরোপকারের তুল্য সদ্‌গুণ দেখা যায় না। বিদ্যাদান অক্ষয়। সুতরাং এগুলি যে আধারে বিদ্যমান ছিল তাঁহার বিষয়ে বিশেষ বর্ণন আবশ্যক। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কেবল গুণসমূহের নামোল্লেখ করিলেও ভূরিভূরি বিষয় লিখিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহার কীর্ত্তিশ্রেণীর নাম নির্দ্দেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিব। হাওয়ার্ড বাল্যকাল হইতে সৎস্বভাবের নিতান্ত বশীভূত ছিলেন। লোকের স্বভাব সকল গুণ অতিক্রম করিয়া মস্তকোপরি থাকে। এই কথার তাৎপর্য্য এই—স্বভাবানুরাগেই সৎ বা অসৎকার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে।

হাওয়ার্ড সৎস্বভাবের ব্যক্তি। তদীয় ইচ্ছা উত্তম কার্য্য ব্যতীত মন্দকার্য্যে ধাবিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মনে হইল যে, পরমেশ্বর তাঁহাকে বহুবিস্তৃত ভূসম্পত্তির অধিকারী

করিয়াছেন। এবং তদীয় পূর্ব্বপুরুষের মিতব্যয়িতায় অনেক ঐশ্বর্য্যও তদীয় হস্তগত হইয়াছে। অতএব ইহার সদ্গতি বিধান না করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হয়। যৎক্ষণাৎ এইটি তাঁহার মানসপটে উদিত হইল, কালবিলম্ব না করিয়া নিজের প্রজা-বর্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ জন্য স্বকীয় অধিকারে উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পরের মুখে রসাস্বাদ করিবার পাত্র ছিলেন না। স্বয়ং সমুদায় প্রজাকে জিজ্ঞাসা ও বাদ প্রতিবাদ করিয়া দুঃস্থ লোক-দিগকে রাজস্বদানে নিষ্কৃতি দিলেন। অপিচ নিরন্ন ও নির্ধন ব্যক্তিবর্গের উপজীবিকা সংস্থাননিমিত্ত নিজব্যয়ে নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বকীয় বদান্যতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রজাবর্গের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা না হইলে অজ্ঞানতা, আলস্য ও অনুৎসাহ খর্ব্ব হইবে না, এই বিবেচনায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। নিজ প্রজাবর্গের মধ্যে যাহার যে অভাব দেখিতেন তাহা তদ্দণ্ডেই মোচন করিতেন। অন্যের দুঃখের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলেই তাহাও দূর করিতে তাঁহার কালবিলম্ব হইত না। এই কারণেই হিন্দুদিগের নিকটে ভূস্বামী পিতা অপেক্ষাও পূজ্য এবং সর্ব্বাগ্রে মাননীয়।

যৌবনের প্রথমাবস্থায় যখন জন হাওয়ার্ড লিস্‌বন নগর (Lisbon) পরিভ্রমণে নির্গত হয়েন তখন পথিমধ্যে তাঁহাকে ফরাশী দস্যুদিগের হস্তে পতিত হইয়া কারাগারের তুল্য কদর্য্য স্থানে প্রায় অনশনে সঙ্গিবর্গের সহিত কয়েক দিন নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই ক্লেশহেতু তাঁহার অন্তঃকরণে

কারাগারে রুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের দুঃখের বিষয় দেদীপ্যমান হইল। তিনি যখন নিজ জন্মস্থান ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন তখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কারাগারের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য আবেদন করিতে ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব করেন নাই। এবং ইহাও কহিলেন যে, ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ কয়েদীদিগকে এখন হইতে কিঞ্চিৎ সদয়ভাবে দেখেন ও তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। অতএব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতশূন্য হইয়া কারাগারে রুদ্ধ ব্যক্তিগণের দুরবস্থা দূর করিতে হইবে। তিনি কেবল আবেদন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। স্বয়ং ইংরেজ রাজ্যের কারাগার পরিদর্শনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বদেশস্থ সমুদায় কারাবাসের দুরবস্থা হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মনে অর্থব্যয়ের দুঃখ হয় নাই বরং তিনি তজ্জন্য মনে মনে অতীব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিজ জন্মভূমি, ইংলণ্ডের অন্তর্গত বেড্‌ফোর্ড। ঐ প্রদেশে যে সকল শিক্ষিত ও মাননীয় ব্যক্তি অতি সামান্য কুটীরে বাস করিতেন তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা মোচনজন্য এবং সাধারণ লোকের শিশুসন্তানগণের জ্ঞানোন্নতিনিমিত্ত নিজ ব্যয়ে অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখের কারণ এই যে, এই ব্যাপারে শিক্ষিত ও মাননীয় ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাকার্য্যে নিয়োগহেতু ছাত্রগণের সহজে জ্ঞানবৃদ্ধি, অভিভাবকের মনে সুশিক্ষার বিশ্বাস এবং উপদেশকগণের উপকারসাধন হইয়াছিল। এমন

কি তাঁহার যাবতীয় অর্থ ছিল তৎসমস্তের অধিকাংশ লোকের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তাঁহার নিজের ভরণপোষণনিমিত্ত যৎসামান্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহাতেই তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না। তিনি নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যয়বিষয়ে নিতান্ত মিতব্যয়ী ছিলেন।

একবার শুনিলেন যে, ভূমধ্যসাগরের প্রত্যেক বন্দরে মহামারীতে অর্ণবযানের লোকসমূহ প্রত্যহ যমসদনে প্রেরিত হইতেছে। এই অকাল মৃত্যু নিবারণ করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য নহে। যেমন ইহা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভৃত্যাদিনিরপেক্ষ হইয়া তিনি স্বয়ং প্রত্যেক বন্দরের অস্বাস্থ্যজনক স্থানের শুদ্ধিবিধান করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতেই প্রত্যেক বন্দরের মহামারীর হ্রাস হইতে লাগিল। এ বিষয়ে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, অর্থব্যয়ের কথা ত সুদূরপরাহত। তিনি তাৎকালিক মহামারী নিবারণ করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন না। সর্ব্বকালের জন্য সর্ব্বত্র চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিলেন। ইহা কি অসামান্য বদান্যতা ও উদারচিত্তের কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না? এই বিষয় যখন জর্ম্মণ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি স্বয়ং মাননীয় জন হাওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এবং হাওয়ার্ডের বহু সম্মান করিয়া কহিলেন, আপনি দেবতা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভিন্ন নহেন। সেই কারণে আমি আপনকার একটি প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। জন হাওয়ার্ড কহিলেন, আপনার তাহা করিতে

হইবে না। আপনার ঐ কার্য্যে যে অর্থব্যয় হইবে সে অর্থ দরিদ্রদিগের দুঃখশান্তিতে নিয়োজিত হইলে আমার অধিকতর সম্মান করা হইবে।

ইউরোপীয় যাবতীয় কারাগার স্বয়ং স্বচক্ষে পরিদর্শন সময়ে তৎসম্বন্ধের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় তত্তদ্দেশীয় সম্রাড্গণকে বিজ্ঞাপন করিতে বিস্মৃত হইতেন না। কারাবাস পর্য্যবেক্ষণ-মন্তব্যে যাহা লিখিত হইত, তাহা দেখিয়া ইউরোপীয় প্রত্যেক সম্রাট্ বা মহারাজাধিরাজগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা প্রকৃতপক্ষেই সাধারণের আশীর্ব্বাদের প্রধান আধার এবং মনুষ্যমণ্ডলের শিরোরত্নস্বরূপ। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি না থাকায় কিছু ক্ষতি হয় নাই, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা যে তদীয় বদান্যতা ও পরোপকারিতার কথা কীর্ত্তিত হইতেছে, ঐ কীর্ত্তন শুনিয়াই লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করে, ইহা কি মৃত ব্যক্তির চিরজীবিত্বের প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে? ইহাতেই কহে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" যাহার কীর্ত্তি আছে সে চিরজীবী।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে যে সময়ে ইউরোপীয় অনেক স্থানে প্লেগের উৎপাতে অনেক লোকের জীবন নষ্ট হইতেছিল তখন জন হাওয়ার্ড সুস্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। একাকী প্লেগস্থানে উপস্থিত হইয়া প্লেগপীড়িত ব্যক্তিবর্গকে সুস্থ করিতেছিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফ্রান্স, ইটালী মাণ্টা, জাণ্টা, স্মীরণা, কনষ্টাণ্টিনোপল, রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ প্রভৃতি স্থানের প্লেগপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সেবাশুশ্রূষা স্বয়ং স্বহস্তে করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করেন। এই বিষয়ে

তাঁহার ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় এবং নিজের অশেষ ক্লেশ হইলেও উহা ক্লেশকর বলিয়া স্বপ্নেও এক মুহূর্ত মনে স্থান দেন নাই। পরন্তু পরমানন্দে অনেক সময়ে অনাহারে এবং অনিদ্রায় কালাতিপাত করিয়াছেন।

কৃষ্ণসাগরে রুষিয়াসম্রাটের যে এক বন্দর ছিল, ঐ স্থানে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে মহামারীজনক সংক্রামক জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ঐ সময়ে জন হাওয়ার্ড তৎপ্রদেশের ঐ মহাবিপজ্জনক জ্বররোগ দূর করিবার নিমিত্ত তথায় যাত্রা করিলেন। সংক্রামক জ্বররোগ দূর করা সহজ ব্যাপার নহে মনে করিয়া, তাহার তৎকালীন সমস্ত অর্থ ঐ বিষয়ে পর্য্যবসিত করিলেন। এবং স্বয়ং সমুদায় পীড়িতের অবস্থা দূর করিবার চেষ্টা করিলেন।

ঐ স্থানের এক অল্পবয়স্কা রমণী সংক্রামক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া হাওয়ার্ডকে আহ্বান করিলেন। স্ত্রীলোকটি জানিত যে, সংক্রামক রোগে তাহাকে কেহ সেবাশুশ্রূষা করিবে না। সে যদি হাওয়ার্ডকে সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জীবনধ্বংস হইবে না; নিশ্চয় জীবিত থাকিবে। সেই স্ত্রী প্রাণবিনাশ হইতে নিশ্চয় রক্ষা পাইবার জন্য হাওয়ার্ডকে আহ্বান করিল। হাওয়ার্ডের সেবাশুশ্রূষায় সংক্রামক জ্বর রোগ ঐ ললনাকে পরিত্যাগ করিল বটে কিন্তু হাওয়ার্ডকে আক্রমণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইল না। অথবা তাঁহাকে আর ইহলোকে পরের দুঃখশান্তিজন্য ক্লেশ স্বীকার করা পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত বলিয়াই তাঁহাকে তিনি স্বর্গে আনয়ন করিলেন।

যে স্থলে এই ঘটনা হয় তাহার নাম চারসন বা কারসন (Cherson)

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে রুষিয়াসম্রাট্ মহামতি আলেকজাণ্ডার মহোদয় জন হাওয়ার্ডের চিরকীর্ত্তি স্মরণজন্য তথায় এক স্তম্ভ (মনুমেণ্ট) সংস্থাপন করেন। সুতরাং এই কার্য্যজন্য ঐ সম্রাট্ সাধারণের নিকটে ধন্যবাদ এবং আশীর্ব্বাদের পাত্র।

ফলকথা, সৎকার্য্যের ফল চিরকালই সুস্বাদ হয়, এবং পরের সুখস্বচ্ছন্দতায় বিনিয়োজিত হইয়া থাকে। সাধু এবং উদারচেতা মহাত্মা ব্যক্তিই ভূমণ্ডলের সকলের আত্মীয়। তাঁহার নিকটে আত্মীয় ও পর বলিয়া কেহই গণনীয় নহেন। সকলেই নিজ পরিজনমধ্যে বিশেষ পরিগণিত।

আদর্শ প্রশ্ন।

এই মহাত্মার (জন হাওয়ার্ড) বিষয় বর্ণন করিতে গেলে আমরা সকল মহাত্মাকেই ইঁহারই অনুকারী ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। বস্তুতঃ কি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডেভিড্ হেয়ার, মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি হাওয়ার্ডের কার্য্যকলাপের অনুশীলন পূর্ব্বক নিজ নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করেন অথবা স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর সারবত্তা সম্যগ্রূপে সমাধান করেন? হাওয়ার্ড কোন্ দেশের লোক কোন্ সময় আলোকিত করিয়াছিলেন? তাঁহার জন্ম, জাতি, কার্য্যকলাপ ও দেশপরিভ্রমণ ও সেই সেই দেশের ভৌগলিক সংস্থান পুরঃসর কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত বল। তাঁহার সম্মানার্থ তদীয় জীবদ্দশায় কোনপ্রকার অনুষ্ঠান হইয়াছিল কি না? ঐ অর্থ তিনি কি বিষয়ে পর্য্যবসিত করিতে বলেন? সে ব্যক্তি কে? পরে তদীয় কীর্ত্তির কথা সকলের স্মরণার্থ কোন্ মহাত্মা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করি-

য়াছেন? সে ব্যক্তি কে এবং কোন্ দেশীয় লোক? হাওয়ার্ডকে জগচ্ছরণ্য জ্ঞান করা যায় কি না? কারাবাস কাহাকে বলে? উহা দুঃখের স্থান কেন? যৎসামান্য, শুদ্ধিবিধান, সুদূরপরাহত, ইহাদের অর্থ এবং সমাসের নামোল্লেখপূর্ব্বক ব্যাসবাক্য লিখ। আত্মীয়, পর, পরিজন ইহাদের প্রতিশব্দ লেখ। সংক্রামক শব্দের অর্থ কি?

দানশীল হাজী মহম্মদ মহসিন।

অন্য বদান্যতার উদাহরণস্বরূপ আর এক মহাত্মার কথা সংক্ষেপে বলিব, যাহা শুনিলে লোকের মনে বিশ্বাস হইবে যে, সৎপদার্থ যেখানে প্রসূত হউক না কেন তাহার সৌরভ, সৌন্দর্য্য এবং সারবত্তা, জন্মস্থানের দোষগুণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে না। দেখ পদ্ম, কোকনদ ও মুক্তা তুচ্ছ স্থলে জন্মিলেও নিজ নিজ মাহাত্ম্যে সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত এবং সকলের শিরোমণি হইয়া থাকে। বিপরীত দৃষ্টান্তে রত্নাকরে শম্বুক, উচ্চ পর্ব্বতশিখরে শাল্মলী বৃক্ষের জন্ম হয়, কিন্তু জন্মস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন কে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপন করে? সংসারে মানবজাতি নিজ নিজ গুণমহিমায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

মহম্মদ মহসিন একজন পারস্যদেশীয় মুসলমান বণিকের পুত্র। ইঁহার পিতার যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য ছিল। তিনি বাণিজ্যব্যাপারে অর্থসংগ্রহ করেন। কিন্তু উহা সৎকার্য্যে বিনিয়োগ করিতে পারেন নাই। বণিগ্‌গণ প্রায়ই কৃপণ হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই বদান্যতা থাকে না। সুতরাং

মহম্মদ মহসীন।

চারু-প্রবন্ধ। ৮২ পৃষ্ঠা।
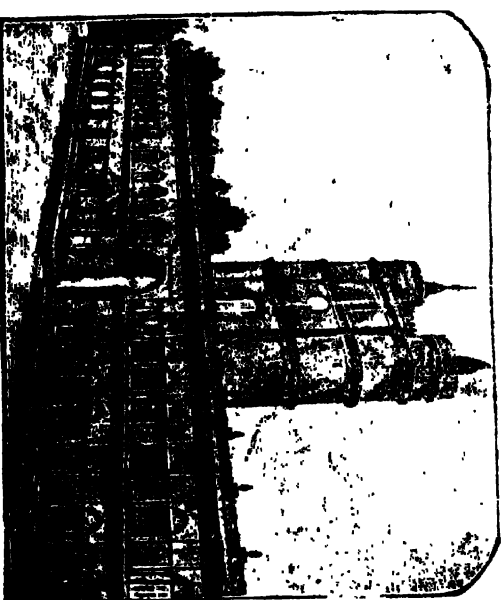
হুগলীর এমাম বাড়া।

চারু-প্রবন্ধ। ৮৪ পৃষ্ঠা।

অনায়াসে এবং অল্পসময়মধ্যে ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে। ইঁহার এক কন্যা ও একটা পুত্রের মধ্যে তিনি কন্যাটিকে একজন ওমরার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই ব্যাপারে যাহা ব্যয়িত হইয়াছিল এইমাত্র। কন্যাটী বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা হয়। তৎকালে তাহার ভ্রাতা মহম্মদ মহসিন বালক ও কনিষ্ঠ। মহম্মদ মহসিনের এই বিধবা ভগিনীর হস্তেই তাঁহার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভ্রাতাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম মনে করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও শিক্ষা দেন।

মহম্মদীয় শাস্ত্রে বিধবার বিবাহ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, মহসিনের ভগিনী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন নাই। সর্ব্বদা পরমেশ্বরপরায়ণা হইয়া দান ও তদীয় চরণাশ্রয় প্রাপ্তিজন্য তপস্যা করিতেন। কিন্তু তিনি অল্পকালমধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তদীয় স্বামীর সম্পত্তি সমেত সমস্ত ঐশ্বর্য্য মহম্মদ মহসিনের ভাগ্যেই বর্ত্তিল। এই সময়ে তিনি তরুণবয়স্ক। তারুণ্যাবস্থায় প্রভুত্ব ও অবিবেকতার সংযোগ ঘটিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু মহম্মদ-মহসিনের তাহা ঘটে নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান ও সৎপথে প্রণোদিত করিলেন।

তাঁহার সঙ্গীরা ও আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহজন্য এক ধনী বণিকের পরম সুন্দরী ললনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিলেন। তিনি ঐ প্রস্তাব শুনিবা মাত্র কহিলেন, যখন জ্যেষ্ঠা ভগিনী নাই, পিতা মাতা নাই এবং আমি একাকী, তখন বিবাহ করিয়া একটী কন্যাকে একাকিনী নির্জ্জনে কারারুদ্ধ করিয়া পাপভাগী হইব না। কারণ আমি নিজে সর্ব্বদাই পরমেশ্বরের চরণারবিন্দে স্থান

পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকি। সুতরাং আমাদ্বারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বিষয়বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। নবযৌবনা ললনা বিষয়াসক্তচিত্তা হইয়া আমাকে বিরক্ত করিবে, আমি উহা সহ্য করিতে পারিব না।

মহম্মদ মহসিনের এই বাক্য শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

মহম্মদ মহসিনের জন্মকাল ইং ১৭৩২, মৃত্যুসময় ১৮১২। এই গণনায় তিনি ইহলোকে অশীতিবর্ষব্যাপক দীর্ঘজীবনে সংসারের যাদৃশ উপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি তাঁহার মৃত্যুকালের উইলপত্রে যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই জগতের অনেকপ্রকার উপকার হইতেছে।

১৮০৬ শালের ৯ই জুন উইল লিখিত হয়। তাহার মর্ম্ম এই, মুসলমানজাতির ধর্ম্মশিক্ষা, দুঃস্থ ব্যক্তির দুর্দ্দশামোচন, দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের জন্য ভিক্ষা ও অন্নদান, নিঃস্ব এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি-বর্গের সুচিকিৎসানিমিত্ত চিকিৎসালয় সংস্থাপনকার্য্যে যথোপ-যুক্তরূপে যথাযথ ব্যয়, এবং সাধারণের শিক্ষার জন্য নিম্ন এবং উচ্চতম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সর্ব্বশেষে তদীয় কীর্ত্তিপতাকার নিদর্শনস্বরূপ সৌধনির্ম্মাণ। এই সকল কার্য্যসমাধাজন্য তদীয় অধিকৃত অতুল সম্পত্তির সমুদায় উৎসর্গ করিয়া যান। তদ্ব্যতীত ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় একলক্ষ বিংশতিসহস্র মুদ্রা।

পাঠকগণ যদি একদৃষ্টে হুগলীর ইমামবাড়ার অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহার নির্ম্মাণপারিপাট্য দেখিয়া

পরমাহ্লাদিত হইবেন। উহার সিংহদ্বারের শিরোভাগে যে ঘড়ী আছে তাহার মূল্য ১১৭২১৲ টাকা।

ইমামবাড়ার সংস্পৃষ্ট অতিথিশালা, ধর্ম্মমন্দিরস্থিত ও নিমন্ত্রিত পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির অভ্যর্থনা এবং তদুপলক্ষে পর্ব্বাহ-সম্বন্ধীয় আড়ম্বরের ব্যয় প্রত্যহ পাঁচশত টাকা বলিলেও ন্যূন বলা হয়। এতদ্ব্যতীত হুগলীকালেজ ও হুগলী এমামবাড়ানামক চিকিৎসালয়ের ব্যয় মাসিক সাত হাজার টাকার অধিক ব্যতীত ন্যূন নহে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট যখন হুগলীকালেজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আইসে তখনই মাসিক পঞ্চসহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হয়। কালেজের উদ্দেশে যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার কিয়দংশ পল্লীগ্রামের নিঃস্ব মুসলমানের ইংরাজী, আর্বী ও পার্শী ভাষার সুশিক্ষাজন্য ব্যয়িত হয়। শেষোক্ত ভাষাদ্বয়ের শিক্ষা-স্থানকে মাদ্রাসা কহে। ইংরাজ শাসনে মহম্মদ মহসিনের ফণ্ড হইতে বঙ্গদেশের ও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমান ছাত্রগণের সর্ব্বত্র অর্দ্ধবেতনে শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা দুঃখী মুসলমান সন্তানমধ্যে বিদ্যাশিক্ষার পথ অতি সুগম হইয়াছে বলিতে হইবে।

আপামরসাধারণ সকল লোকেই তদীয় বদান্যতার ফলভোগী বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। কারণ হুগলী জিলার এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকপরম্পরার জ্ঞানোন্নতিবিষয়ে মহম্মদ মহসিনের হুগলী কালেজ ও চিকিৎসালয় সর্ব্বাদিম কীর্ত্তি সরো-বর। তৎপরে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্যস্থানের কালেজ ও চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই সমুদায় ব্যাপারের তত্ত্বাবধানকার্য্য গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শনের অধীন। তবে ইমামবাড়ানামক ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্য এক সুশিক্ষিত মুসলমান কর্ত্তার অধিনায়কতায় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। মহম্মদ মহসিনের গবর্ণমেণ্টসঞ্চিত অর্থের সুদ ব্যতীত জমীদারীর বার্ষিক আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। সমস্তই উইলের নিয়মানুসারে রীতিমত ব্যয়িত হইয়া থাকে। তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

আদর্শ প্রশ্ন।

মহসিন কোন্ দেশীয় লোক? (মহম্মদ মহসিন) হুগ্লীতে আসিয়াছিলেন কেন? তৎকালে হুগ্লীর অবস্থা কিরূপ ছিল? এই পুস্তকে বলা হয় নাই যে, পূর্ব্বে শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, হুগ্লী ইংরজাধিকৃত ছিল না, এখনও ফড়াসডাঙ্গা ফরাসীদিগের অধিকারে আছে। আকবর বাদসাহের নিকট ইংরাজেরা কলিকাতায়, ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায়, পোর্ত্তুগীজেরা হুগ্লীতে, দিনেমারগণ শ্রীরামপুরে, ফরাসীরা চন্দননগরে বাণিজ্যব্যাপারে অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। পরে বাদসাহগণ নিস্তেজ হইলে প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানের স্বামিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এতদুপলক্ষে বাঙ্গালার নবাবদিগের সঙ্গে অনেক বিবাদবিসংবাদ হইয়া গিয়াছে। এইসকল কথা পুস্তকে উল্লিখিত হয় নাই। তোমরা ইতিহাস পাঠ করিয়াছ। এ বিষয়ে যাহা জান তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বল। মহম্মদ মহসিনের সময়ে হুগ্লীর অবস্থা পতন অথবা উন্মেষকাল। ১৫০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে রোম, ইটালী, ফিনিসীয় প্রভৃতি বণিকেরা হুগ্লী বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহারা ভারতে কি দ্রব্যের সঙ্গে কি দ্রব্য বিনিময় করিত। অথবা কেবল পণ দিয়া কি দ্রব্য অতি অপূর্ব্ব বলিয়া ইউরোপে বাণিজ্য করিত? 'সংসারে মানবজাতি নিজ নিজ গুণমহি-

যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়' এই উক্তি কিরূপে সমর্থন কর। মহসিন চিরকুমার ছিলেন কেন? তাঁহার ভগিনী তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করায় তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন? তাঁহার উইলের মর্ম্ম কি? মুসলমানজাতির শিক্ষার্থ তিনি কি করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার নিকট মুসলমানজাতি কৃতজ্ঞ কি না? মাদ্রাসা ও সাধারণ বিদ্যালয়ে পার্থক্য কি?

জীবরহস্য।

নিতান্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণিসমূহের প্রতি যদি সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উহারাও মনুষ্যপ্রকৃতির সমুদায় গুণসম্পন্ন হউক বা না হউক কোন কোন বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষাও সুনিয়মসম্পন্ন এবং শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে।

পালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ, অশ্ব, গজ, ছাগল, মেষ, বিড়াল, কুক্কুর, সিংহ প্রভৃতি জীবকে প্রতিপালকের বিশেষ বশীভূত হইতে দেখা যায়। এই সকল জন্তু প্রতিপালকের প্রতি কদাচ কোন অত্যাচার করে না। অনেক সময়ে স্থলবিশেষে উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয়স্বরূপ সাধ্যমত উপকার করিতে চেষ্টা করে।

ইহা শুনা গিয়াছে যে, একটি সিংহ এক সময়ে বন্য হস্তী ও গণ্ডারের নিকটে যুদ্ধে পরাভূতাবস্থায় মৃতপ্রায় হইয়া পথিমধ্যে পতিত আছে, এমন সময়ে এক দস্যু সেই স্থান দিয়া পলায়ন করিতেছিল। হঠাৎ ঐ হিংস্র পশুরাজ সিংহকে দেখিয়া তাহার অত্যন্ত ভয় জন্মিল। সে নিজের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত

একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার নিকটে যে অন্ন ও পানীয় জল ছিল উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিল।

সিংহ উহাকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল অন্নজল গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু ঐ মানবদস্যুর কোনপ্রকার চেষ্টা না দেখিয়া সিংহ মনে করিল ঐ ব্যক্তি তাহার ক্ষুৎ-পিপাসার শান্তিমানসে তাহাকে ঐ অন্নজল দিয়াছে। সিংহ খাদ্য ও জল গ্রহণ করিয়া সুস্থ হইল। অনেকক্ষণ বৃক্ষস্থিত উপকারী মনুষ্যকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। বৃক্ষস্থিত দস্যু তখন ভাবিল, আর নিস্তার নাই। ভয়ে তাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সিংহ ইহা মনে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। ইহার কিছুদিন পরেই ঐ সিংহ ধৃত হইয়া তুরস্কের রাজ-বাটীতে আনীত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইল। এই ঘটনার দুই চারি দিন পরেই ঐ দস্যুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তাহাকে ঐ নূতন ধৃত সিংহের মুখে প্রক্ষেপ করাই রাজাজ্ঞা। সুতরাং ঘাতকপুরুষেরা দস্যুকে নবাবদ্ধ সিংহের সম্মুখে প্রক্ষেপ করিল। সিংহ দস্যুকে নিঃসংশয়ে চিনিতে পারিল ও তাহার প্রাণরক্ষক মনে করিয়া তাহার পদলেহন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দর্শক মাত্রই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও অবাক্ হইলেন। সিংহ অবশেষে তাহার পাদদ্বয়ে আপনার মস্তক লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, ইহা দেখিয়া দস্যু তাহাকে চিনিতে পারিল। রাজা ও রাজ-মন্ত্রী দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কখনও ইহাকে কিছু আহার করিতে দিয়াছিলে? "আজ্ঞে হাঁ" এই উত্তর দিয়া সে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় সর্ব্বসমক্ষে নিবেদন করিল। রাজা তখন

তাহার সহিত খেলা করিতে কহিলেন। দস্যু মনে করিল, রাজা এখনও তাহার প্রতি বিশ্বাস করেন নাই। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বলবতী রাখাই তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। সে যাহাই হউক ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইলেও রাজদণ্ড হইতে নিস্তার পাইব না। তবে খেলা করাই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া সে নৃপাদেশানুসারে ঐ সিংহের সঙ্গে খেলায় প্রবৃত্ত হইল। সিংহ তখন পরমানন্দে নাচিতে নাচিতে নিজের লাঙ্গুল প্রাণদাতা দস্যুর মস্তকে সঞ্চারণ করিতে লাগিল। উহাকে কোন প্রকারেই হিংসা করিল না। তখনও দস্যুর কথায় কাহারও প্রত্যয় হইল না। কিন্তু ঐ দিন আর একজন দস্যুরও প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল। তাহাকে ঐ সিংহের সম্মুখে দিবামাত্র সিংহ তাহার প্রাণসংহার করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। এখন পুনর্ব্বার দস্যুর প্রতি রাজাদেশ হইল যে, তুমি আর একবার সিংহের সঙ্গে ক্রীড়া কর। পশুরাজ সিংহ এবারে অত্যা-হ্লাদের সঙ্গে উপকারক দস্যুর চরণে নিপতিত হইয়া মৃতবৎ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অতঃপর সকলের অভিপ্রায়মত সে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

ব্যাঘ্র ও হস্তীর বিষয়ে এরূপ ঘটনার কতপ্রকার আশ্চর্য্য-জনক কথা শুনা যায়, তাহা লিখিবার প্রয়োজন দেখি না। সকলেই কিছু না কিছু জানেন।

বানর (বাঁদর) জাতির অনুকরণশক্তি অতি প্রবল। এই পশু কেবল কথা কহিতে অসমর্থ নচেৎ মানুষের মত সমুদায়

বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করে। বাজীকরদিগের পোষিত বানরের কৌশলসমূহ সকলেই প্রায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাজী-করদিগের আদেশমত কখনও পদাতিক, বিচারক বা শাস্তার ন্যায় ভাব দেখায়। কখন বা অশ্বারোহী সাজিয়া ছাগলের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। কখন বা ক্ষুর লইয়া আপনার দাড়ী ক্ষৌর করিবার চেষ্টা করে, এই সকল কৌতূহলজনক ব্যাপার দেখিয়া কে না চমৎকৃত এবং অবাক্ হয় ?

ভল্লুক অতি হিংস্র জন্তু; কিন্তু সেও মনুষ্যবুদ্ধির নিকটে পরাভূত হয়। তাহার প্রতিপালক তাহাকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করে, ভল্লুকের প্রবৃত্তি ঐ প্রতিপালকের বিরুদ্ধ হইলেও, ভল্লুককে উহার নিদেশবশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলেই পালকের প্রহারে ভীত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে থাকে। ইহাও একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

পালিত ও বন্য হস্তী ও অশ্বের প্রকৃতির বিভিন্নতা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং উহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

বিবরের গৃহনির্ম্মাণ ও নদীতে সেতুনির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে লোকে উহা মানবজাতির শিল্প বলিয়া মনে করিবেন। মানব-জাতির গৃহস্থগণের আবাসবাটীতে যেরূপ বাতায়ন, গৃহদ্বার ও সোপানাদি থাকে, বিবরের গৃহেও তদ্রূপের কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নতা দেখা যায় না। তাহাদিগের মধ্যেও একজনের কর্ত্তৃত্ব অবিসংবাদী। কর্ত্তার অনুবর্ত্তী হইয়াই সকলে সমবেত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাতেই স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুসারে অতি সুশৃঙ্খলার সঙ্গে ও অতি

পরিপাটীক্রমে উহারা নিজ নিজ সন্তানাদির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাস করে।

গো, মেষ, মহিষাদি গ্রাম্য পশুগণও প্রতিপালকের আদেশের নিতান্ত অনুবর্ত্তী হইয়াই চলিয়া থাকে, ইহা কাহার না বিদিত আছে ?

কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত প্রাণী আর দেখা যায় না। কুকুরের স্মারকতা শক্তি, প্রভুভক্তি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারেন ?

এক মহাজনের একটি কুকুর সর্ব্বদা দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকিত। উহা প্রভুর কার্য্যপরম্পরা নিরীক্ষণ করিত। প্রভুর সঙ্গে যাহার সংস্রব দেখিতে পাইত তাহার আগমন বা প্রতিগমনসময়ে ঐ কুকুর কোনপ্রকার শব্দ করিত না। কিন্তু নবাগত ব্যক্তি দেখিলেই একান্ত চীৎকারশব্দে প্রভুকে নবাগত ব্যক্তির আগমনবার্ত্তা ঈঙ্গিত করিত। প্রভু তাহাকে কিছু না বলিলেও সে প্রভুর পরিচিত বন্ধুগণের প্রতি তাহার অভ্যর্থনা ও বিদায়সূচক ধ্বনি করিত।

এক দিন ঐ মহাজনের নিকটে কোন এক অপরিচিত ধূর্ত্ত ও বঞ্চক উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র কুকুর অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। মহাজন বুঝিলেন, নূতন লোক আসিয়াছে। ঐ ব্যক্তিকে মহাজন বসিতে বলিলে, কুকুর চুপ করিল। কিন্তু মহাজন যেমন অন্যমনস্ক হইয়াছেন, ইত্যবসরে ঐ বঞ্চক একটি টাকার তোড়া লইয়া বহির্গত হইল। কুকুর তখনই শব্দ করিল, কিন্তু মহাজন অন্য এক ব্যক্তির বিনির্গমন-

জন্য কুকুরকে নিস্তব্ধ হইতে কহিলেন। বঞ্চকও ঐ সুযোগে পলায়ন করিল। মহাজনের তখন চৈতন্য হইল যে, বঞ্চক টাকার তোড়া লইয়া গিয়াছে।

কুকুর ঈঙ্গিত পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল, কিন্তু সে কোথায় লুক্কায়িত হইল তাহার সন্ধান পাইল না। কুকুর তাহার আকার প্রকার বিশেষরূপে অগ্রে লক্ষ্য করিয়াছিল। মহাজন একদিন নদীতে স্নান করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ বঞ্চক তথায় উপস্থিত হইল। মহাজনের সেই কুকুর সঙ্গে ছিল। কুকুর ঐ বঞ্চককে দেখিবামাত্র ঘেউ ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। মহাজন তখন সর্ব্ব-সমক্ষে ঐ ধূর্ত্তের ব্যবহার নিবেদন করিলেন। ধূর্ত্তকে কুকুর ক্ষত বিক্ষত করিল। ধূর্ত্ত তখন মহাজনকে কহিল, মহাশয়, আমাকে রক্ষা করুন। মহাজন দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, আমার অর্থগুলি দেও, আমি আর তোমার নামে রাজদ্বারে কিছু অভিযোগ করিব না। তখন সে নিজের পরিত্রাণজন্য টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। কুকুর প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া নিঃশব্দ হইল। কুকুরের স্মারকতা শক্তিতেই মহাজনের নষ্টোদ্ধার হইল। ইহা কি প্রভুভক্তির নিদর্শন নহে ?

প্রভুর পীড়া হইলে বা অশান্তিজনক কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে কুকুর নিজের পীড়া ও অস্বচ্ছন্দতা জ্ঞান করে, মৌনভাবে থাকে এবং প্রভুর অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুসারে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করে। কোনরূপ ব্যতিক্রম করে না। একদিন এক ভদ্রলোক অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে অর্থের পোঁটলা লইয়া স্থানা-

স্তরে যাইতেছিলেন। তাহার সঙ্গে তদীয় পালিত কুকুর ছিল। অশ্বের সঙ্গে কুকুর দৌড়িতে পারে না সত্য, কিন্তু নিতান্ত দূর পথের পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকে না। একটা নদী পার হইবার পূর্ব্বে অশ্বারোহীর টাকার পোঁটলাটি পড়িয়া গেল। অশ্বারোহী তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, কুকুর নদীর ধারে আসিয়াই দেখিল প্রভুর টাকার পোঁটলা পড়িয়া আছে। সে অনেক চীৎ-কার করিল কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ পাইল না। সে পোঁটলা আগু-লিয়া বসিয়া রহিল। প্রভু বাটী আসিয়া দেখেন যে তাহার টাকার পোঁটলা নাই। কুকুরও অনুপস্থিত। তিনি পুনর্ব্বার অশ্বারোহণে ঐ নদী পার হইয়া দেখেন কুকুর পোঁটলার উপর শয়ন করিয়া আছে। তখন ঐ অশ্বারোহী বুঝিলেন কুকুর কেমন প্রভুভক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং তাহার স্মারকতাশক্তি কত প্রবল। তিনি যখন টাকার তোড়া বাঁধেন তখন যে রঙের বস্ত্রে পোঁটলা বাঁধিয়াছিলেন, কুকুর তাহা দেখিয়াছিল। উহা-তেই তাহার পোঁটলার কাপড়ের রঙ্ স্মরণ ছিল। কুকুর জানিল ইহা অবশ্যই তাহার প্রভুর পোঁটলা।

মৌমাছির মধুক্রম ও মধুসঞ্চয়ব্যাপার দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি না আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিতে পারেন। তাহারাও মনুষ্যের ন্যায় সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। পিপীলিকা ও পুত্তিকার বিষয় আলোচনা কর, দেখিবে তাহারাও সমাজবদ্ধ হইয়া সুনিয়মে আপনাদিগের জীবনোপায় সংস্থাপনপূর্ব্বক আত্মীয়গণের প্রতি মায়া মমতা ও স্নেহাদি দেখাইতে ত্রুটি করেন না। পরস্পরের প্রতি শত্রুতাও দেখা যায়।

পক্ষিজাতির মধ্যে কতকগুলিকে শিক্ষা দিলে তাহারা মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে এবং পালিত পক্ষিগণ স্থলবিশেষে অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি কে ?" যদিও ইহা অভ্যাসের ফলমাত্র। কারণ যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে সমর্থ নহে বটে, তথাপি উহাদিগের মন নূতন শিক্ষার দিকে সর্ব্বদা ধাবিত থাকে। নচেৎ উহারা নানাকথা কি প্রকারে অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় এবং পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিকে জানিতে পারে। অনেক সময়ে অভ্যাসবশতঃ গৃহস্থের সমুদায় রহস্যকথাই প্রকাশ করিয়া দেয়।

এক সাহেব এক গৃহস্থের একটি শিক্ষিত ময়না পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ পাখীর নিকটে শাশুড়ী এবং বৌ প্রভৃতির ঝগড়া শুনিতেন। আর একজন সাহেব এদেশীয় হিন্দু গৃহস্থের পোষিত ও শিক্ষিত কাকাতুয়া পাখী পাইয়াছিলেন। সে সর্ব্বদা রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক নানাবিধ গান করিত। সাহেব সর্ব্বদা তাহাকে অন্যপ্রকার বুলি বলিতে কহিতেন। পাখী ঐ প্রকারে বলিত "পাখী তুমি অন্য প্রকার বুলি বল, না বল তোমাকে খাইতে দিব না" সাহেবের নিকট ঐ পাখীর এই পর্য্যন্ত পাঠবৃদ্ধি হইল। ইহা কি চমৎকার বলিয়া বোধ হয় না ?

বাবুই পক্ষীর বাসা অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। শীতাতপে অথবা বর্ষায় ঐ বাসায় বাস করিতে তাহাদিগের কোনপ্রকার ক্লেশ জন্মে না। পূর্ব্বাপর একরূপ প্রণালীতেই বাবুই পক্ষীর বাসা নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে সুতরাং মনে

হয় এই পক্ষিজাতিও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা মাতার দৃষ্টান্তেরই অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে। কারণ উহাদের আত্মরক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য।

সর্প অতি হিংস্র জীব হইলেও তাহাদিগের নিজ সন্তানের প্রতি মায়া মমতা দেখা যায়। তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে সর্পের যতগুলি ডিম্ব হয় তাহার অধিকাংশ ফুটিতে না ফুটিতে সর্পে খাইয়া ফেলে। সর্পিণী নিজের ডিম রক্ষার জন্য অন্য গর্ত্তে লুকাইয়া রাখে। উহাদিগের মধ্যে যেগুলি জীবিত থাকে তাহা হইতে যে ড্যাঁপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র সর্প বহির্গত হয় তাহাই ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড আকারের বিষধর হইয়া থাকে। সর্পে যদি ডিম না খাইত তাহা হইলে উহাদিগের সংখ্যা কত বর্দ্ধিত হইত তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক সর্পজাতিও মনুষ্যের কৌশলে ধৃত হয় এবং কুহকের কিঞ্চিৎ বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন উদ্ধগ্রীবায় ফণামণ্ডল স্থির করিয়া চক্ষুশ্রব হইয়া বিষবৈদ্যের (মালোগণের অর্থাৎ সাপুড়ের) গান শুনিতে থাকে। কিন্তু যে সকল সর্প গীত শুনে, সাপুড়েরা অগ্রে তাহাদিগের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দেয়। পুনর্ব্বার দন্তোদ্গম হইলেই সাঁড়াশীদ্বারা উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। বিষদাঁত হইতে যে বিষ নির্গত হইয়া থাকে, মালোরা তাহা চিকিৎসকদিগের নিকটে বিক্রয় করে। তাঁহারা ঐ বিষ দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

যে সকল সর্প মালোরা বদ্ধ করিয়া রাখে, তদ্দ্বারা তাহারা ইন্দ্রজালের ভাণ করিয়া লোকের সম্মুখে ক্রীড়া করে। তাহা-

দিগের লীলাখেলা দেখিয়া লোকের একটা বিস্ময় জন্মে। বারংবার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেও উহা পুনর্ব্বার জন্মে। তখন আবার ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। সাপুড়েরা বিষধর সর্পকে নিস্তেজ ও নির্বিষ করিয়া বহির্গত করে। নচেৎ তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করে না। ফল কথা ঈশ্বর মনুষ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধি দিয়াছেন তাহাতেই নরগণ সকলেরই উপরে কর্ত্তৃত্ব করে।

আদর্শ প্রশ্ন।

জীবরহস্য পদের অর্থ কি? সিংহ, বানর, কুকুর, বিবর, মৌমাছি, বাবুই পাখী, এই সকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তি বা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক জীবরহস্য পদের সার্থকতা দেখাও। কৃতজ্ঞতা' কাহাকে বলে? 'কৃতজ্ঞতা ও 'পরোপকার' এই দুই শব্দে পার্থক্য কি? প্রত্যক্ষ, উপকার, অপকৃষ্ট, আঘাত, আঁধার, কৃতজ্ঞ, রোগ, স্নেহ ও রোষ এই শব্দ কয়েকটির বিপরীতার্থ শব্দ বল। 'ব্যতিব্যস্ত' পদ কি প্রকারে হইল? ইহার অর্থ কি? ব্যতিব্যস্ত হইলে লোকের অবয়বে ঐ ভাবব্যঞ্জক কিরূপ লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়? লক্ষ ও লক্ষ্য এই দুইয়ের প্রভেদ কি? 'অন্নজল' কি সমাসনিষ্পন্ন? 'জলঅন্ন' পদ হয় কিনা? 'উপক্রম' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? উপসর্গ কাহাকে বলে? 'উপক্রম' শব্দে কোন উপসর্গ আছে কি? ক্রম্ ধাতুর পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যোগে ভিন্নার্থবোধক কয়টি শব্দ বলিতে পার? 'সম্মুখে' না লিখিয়া 'সন্মুখে' লিখিলে ভুল হইবে কি? এবং কি ভুল হইবে? 'কৃ' ধাতুর পূর্ব্বে অনু, সম্, অধি এই তিন উপসর্গ যোগ করিয়া তিনটী শব্দ ও উহাদের অর্থ বল। 'বানরজাতির অনুকরণশক্তি অতি প্রবল' দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। গমন, আগমন বিনির্গমন, প্রতিগমন এই চারিতে প্রভেদ কি? বন্য,মৃত, পানীয়,নূতন, বিশ্বাস, প্রবৃত্ত, কৃতিত্ব

পোষিত, ভক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শয়ন, চৈতন্য, স্নান, গীত এই পদ গুলির মধ্যে বিশেষণকে বিশেষ্যে এবং বিশেষ্যকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত কর। পরাকাষ্ঠা, প্রত্যক্ষ, অবাক্, দণ্ডারণ, নিদেশবশবর্ত্তী, স্বভাবসিদ্ধ, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ক্ষুৎপিপাসায়, মধুক্রম, মধুসঞ্চয়ব্যাপার, চক্ষুশ্রব, দন্তোদ্গম এই পদসকলের অর্থ লিখ এবং সমস্তপদের ব্যাসবাক্য লিখ ও সমাসের নাম কর।

কৃষ্ণপান্তি (রাণাঘাটের পাল চৌধুরী)।

যাঁহাদিগের মনে সরলতা, ধৈর্য্য, পরোপকারিতা গুণ থাকে, পরশ্রী দেখিলে আনন্দ এবং সত্যনিষ্ঠাদি সদ্গুণের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা দীন জনের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিলেও যথা সময়ে ঐ সকল গুণের কার্য্যকারিতা দেখাইতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। সময়ে নিজে অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ হইলেও ঐ সকল গুণের কার্য্যে আপনাকে হীনপ্রকৃতি মনে করেন না। অন্যে উপহাস করিলেও সে বিষয়ে তাঁহাদিগের অন্তরে ব্যথা জন্মে না এবং তজ্জন্য অন্যকৃত উপহাসের পাত্র হইয়াও আত্মকর্ত্তব্য হইতে পরিচ্যুত হয়েন না। অপিতু সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ ও সুখী জ্ঞান করেন। আমরা এই প্রসঙ্গে যে মহানুভাবের নাম নির্দ্দেশ করিব, তিনি রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বাবুদিগের খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং ঐশ্বর্য্যের নিদানস্বরূপ।

ইনি তিলিবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন। সামান্য ব্যবসায় দ্বারা দিন যাপন করিতেন।

তাঁহার তিনটিমাত্র পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কৃষ্ণপান্তি জ্যেষ্ঠ, শম্ভুকান্ত কনিষ্ঠ। কেহই সামান্য হিসাব ব্যতীত অন্য কোনরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তবে সকলেই শিষ্ট, শান্ত ও সৎস্বভাবান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। সেইজন্য লোকে তাঁহাদিগকে বিশেষ বিশ্বাস করিত। তাঁহাদিগের চরিত্রও পবিত্র ছিল। সেই হেতু কৃষ্ণপান্তি সত্যনিষ্ঠার আদর্শ হইয়া আছেন। সুতরাং আমরা কৃষ্ণপান্তির বিষয়েই কিছু বলিব।

কৃষ্ণপান্তি যৌবনের প্রারম্ভসময়ে রাণাঘাটের তিন ক্রোশ দক্ষিণে গাঙ্‌নাপুরের হাটে পান বিক্রয় করিতেন। অবসর পাইলে এবং সময় বুঝিলে মুগকলায়াদি শস্যেরও বিক্রয়ে আবদ্ধ হইতেন। তিনি প্রত্যহ গ্রামের নিম্নস্থ চূর্ণী নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। সেই সূত্রে মহাজনী কারবারের প্রধান প্রধান দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেন এবং ব্যবসায়ের উৎকর্ষাপকর্ষদৃষ্টে কেমন সময়ে কোন্ বস্তু ক্রয় করিতে হইবে এবং উহার বিক্রয়সময়ে কি কি প্রকার লাভ হইবে তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেন। কিন্তু একদিনও সদুপায়ে অর্থসংগ্রহ ব্যতীত অসদুপায়ে ধনার্জ্জন করিবার অভিলাষ করেন নাই।

এখন তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবসময় উপস্থিত। তিনি নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পণ্টন-নৌকা এবং এক সওদাগরের নৌকার বহর ঘাটে লাগিল। তাঁহাকে সওদাগরেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে ছোলার দর

কত। তিনি প্রকৃত দর বলিলেন। তাঁহারা কহিলেন, তোমার সঙ্গে এই দর স্থির থাকিল, এতদিনমধ্যে এত ছোলা আমাদিগকে দিতে হইবে। তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। উভয়ের অঙ্গীকারপত্র লিখিত হইলে, কৃষ্ণপান্তি কহিলেন, আমি নিঃস্ব ব্যক্তি, আপনারা যদি অগ্রে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করেন, তাহা হইলে আমার অঙ্গীকৃত সময়ের পূর্ব্বে দ্রব্য পাইতে পারেন। এইরূপে আপনাদিগের বিশেষ লাভও হইবে। এখন যেমন এ দেশের বাজারে শস্যের মূল্য সুলভ আছে, দুই চারি দিন পরে তেমন সুলভ থাকিবে না, শস্য দুর্মূল্য হইবে। আক্রা দরে কিনিলে যদি বাজার নরম হইয়া যায়, আপনাদিগের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

সওদাগরেরা অর্থসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহাদিগের জানা ছিল যে, আড়ংঘাটার ঠাকুর ৺যুগলকিশোরের মঠবাটীতে বহুপরিমিত ছোলা বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া মঠের অধ্যক্ষ মহান্তমহারাজের নিকটে তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ করিতে পারে না। কৃষ্ণপান্তি মধ্যে মধ্যে তথায় ঠাকুরদর্শনোপলক্ষে পান বিক্রয় করিতে যাইতেন। তাঁহার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও দেবতার প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া মহান্ত মহারাজেরা তাঁহার সঙ্গে অনেক কথোপকথন করিতেন। কৃষ্ণপান্তির ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ায়, তাঁহার যুগলকিশোর দর্শনাভিলাষ জন্মিল, আনুষঙ্গিক ছোলা বিক্রয়ের কথার একটা স্থিরনিশ্চয়তা জানিবার ইচ্ছা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আড়ংঘাটায় যাত্রা করিলেন।

ঠাকুরদর্শনান্তে প্রসাদ পাইয়া, মহান্তমহারাজদিগের ভোজনান্ত নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিবার জন্য পরমোদ্যগী, ইহা দেখিয়া, কৃষ্ণপান্তি সুমধুর স্বরে, যুগলমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরসম্মুখে বিদায় গ্রহণচ্ছলে একটি শ্লোকের কিয়দংশ আবৃত্তি করিবামাত্র মঠাধ্যক্ষ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি কি জন্য আজি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছ, তোমার বাটী যাইতে অনেক রাত্রি হইবে। কৃষ্ণপান্তি কহিলেন, মহারাজের যদি ক্রোধ না হয়, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; শ্রীশ্রীযুগলকিশোর ঠাকুরের গোলার ছোলা নাকি বিক্রীত হইবে। মহান্ত কহিলেন, হাঁ, সে অনেক, তোমার ক্ষমতার অসাধ্য। কৃষ্ণপান্তি কহিলেন, আমি এক সওদাগরের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইব। মহান্ত কহিলেন, তবে দেখ, দর স্থির কর। বায়নাপত্র লেখাপড়া কর। কৃষ্ণপান্তি স্বীকৃত হইলেন।

এখন গোলার ছোলা পরীক্ষাজন্য মহান্তের বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতি আদেশ হইল। ভৃত্য সমস্ত গোলা পরীক্ষা করিয়া কহিল, ছোলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দানার অর্দ্ধেক মাত্র শস্য দেখা যায়। মহান্তের আদেশ হইল, ছোলা জলে ফেলিয়া দেও অথবা সাধারণ দুঃখী লোককে বিতরণ কর। কৃষ্ণপান্তি প্রথমে হতাশ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সুতরাং তাঁহার এই প্রত্যুৎপন্নমতি উপস্থিত হইল,—তিনি কহিলেন, মহারাজ, যদি আট আনা মণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে ছোলা জলে ফেলিতে হইবে না। আমি সমস্ত

গ্রহণ করিব। মহান্ত তথাস্তু বলিয়া সম্মতি দিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজ সন্ধ্যাবন্দনায় ব্যাপৃত হইলেন।

কৃষ্ণপান্তি পরদিন সওদাগরদিগের নিকটে আসিয়া ছোলার অবস্থা বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা সেই দিনই কলিকাতার বাজারে ছোলা নাই, এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। ছোলার ডাইল ও ছাতু করিয়া পলটনদিগকে দিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টের নিকটে তজ্জন্য তাঁহারা প্রতিভূ আছেন। সুতরাং কীটক্ষত ছোলা লইতে সম্মত হইলেন এবং কৃষ্ণপান্তিকে অর্থসাহায্য করিলেন।

কৃষ্ণপান্তি পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহান্তমহারাজের সম্মুখে টাকার তোড়া সংস্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন, কি পরিমাণ ছোলা পাইবে তাহার স্থিরতা নাই, তুমি অগ্রে টাকা দেও কেন? কৃষ্ণপান্তি কহিলেন, এখন মহাশয় আমার ধনরক্ষক, পরে গ্রহণকারী। তিনি আরও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, শীঘ্র শীঘ্র ছোলা উঠাইয়া লও। কৃষ্ণপান্তি ছোলা উঠাইয়া লইতে লাগিলেন, কিন্তু প্রত্যেক গোলার চতুর্থাংশমাত্র কীটক্ষত, অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ পরিপুষ্ট এবং সুন্দর অবস্থায় আছে। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণপান্তি মহান্তমহারাজকে কহিলেন, মহারাজ, ছোলার অবস্থা বার আনা ভাল। অতএব তাহার দর অধিক হইবে, আপনি নূতন দর স্থির করুন। তিনি কহিলেন, আমি কল্য তোমাকে সমুদায় ছোলা আট আনা দরে দিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার পূর্ব্বে আমি সমুদায় জলে ফেলিয়া দিবার আদেশ করিয়াছিলাম। তুমি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তুমি ত প্রক্ষিপ্ত দ্রব্য অনায়াসে বিনামূল্যে পাইতে, কিন্তু, ৺যুগলকিশোরের ক্ষতি হয়

দেখিয়া, তুমি মূল্য স্থির করিয়া দেবভক্তি প্রদর্শন করিয়াছ। পরমেশ্বর তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তোমার বস্ত্র কীট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে কি না হয়! তুমি তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তি; সমস্ত ছোলাই তোমার নিকটে কীটক্ষত ছোলার মূল্যে বিক্রয় করিলে আমার প্রতিজ্ঞা স্থির থাকিবে। নচেৎ আমি সত্যব্রত হইতে পরিভ্রষ্ট হইব।

সওদাগরেরা সমস্ত উৎকৃষ্ট ছোলা পৃথগ্‌রূপে মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেন, কৃষ্ণপান্তিকে কলিকাতায় কারবার করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় প্রত্যয় করিয়া বিলাতে সূতার কারবারে তাঁহার নাম সংযোজনা করিয়া দিলেন। তথা হইতে সাদা সূতার গাঁটী আসিবার কথা ছিল। এখানে যে সকল গাঁটী আসিল তৎসমস্তই লাল। সাদা অপেক্ষা লাল সূতার মূল্য অধিক। কৃষ্ণপান্তি ইহা দেখিয়া বিলাতে জানাইলেন যে, আপনারা ভ্রান্তিক্রমে লালরঙের সূতা পাঠাইয়াছেন। ইহার মূল্য কত অধিক দিতে হইবে? বিলাতী সওদাগরেরা কহিলেন, আমরা এখানকার চালান দেখিলাম, আমরা সাদা সূতা পাঠাইয়াছি। আপনার ভাগ্যে উহা লাল হইয়াছে; আমরা আর অতিরিক্ত মূল্য প্রত্যাশা করি না। অধিকন্তু আপনার ভদ্রোচিত ব্যবহারে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে লিখিলাম যে এমন সাধু ব্যক্তি অতি বিরল। গবর্ণমেণ্ট তদবধি কৃষ্ণপান্তিকে লবণব্যবসায়ের মহাজনগণমধ্যে অগ্রগণ্য করিয়াছিলেন। তিনি যত লবণ লইতেন তাহার মূল্য সমুদায় অগ্রে

দিতে হইত না। বিক্রয় হইলে সেই সেই স্থানের কালেক্টরকে দিলেই তিনি নিষ্কৃতি পাইতেন।

শশালা বন্দোবস্তে অনেক জমীদারের দুরবস্থা ঘটিল। অনেক বিষয়বিভব বিক্রীত হইতে লাগিল। কৃষ্ণপান্তি এই সুযোগে অনেক জমীদারী ক্রয় করিলেন। তিনি মহাসমৃদ্ধি-শালী জমীদার হইয়াছেন. সৌভাগ্যের সীমা নাই। এ সময়ে তাঁহার বাল্যবন্ধু নিধিরাম প্রামাণিকের কষ্ট দূর করিবেন মনে করিয়া, একদিন গাঙ্‌নাপুরের হাটের পথে নিধিরাম দাদার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিধিরাম দাদা একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, মোট বহিতে নিতান্ত অসমর্থ, ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ-পান্তি কহিলেন, দাদা, আমার মাথায় মোট দে। আমি পূর্ব্ববৎ এক সঙ্গে বহন করিতে করিতে গল্পে গল্পে বাটী যাইব, আমার আনন্দ হইবে। নিধিরাম কহিলেন, না। কৃষ্ণপান্তি কহি-লেন, আমি কি কাহারও ভয়ে তোমার মোট বহিতে লজ্জিত হইব? কখনও না, এই বলিয়া নিধিরামের মস্তকের ভার নিজ হস্তে নিষ্কাষণ করিয়া নিজ মস্তকে সমর্পিত করিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। দেখ, কিরূপ মহত্ত্ব! ভ্রাতা ও পুত্রাদি পরিজনবর্গ এই বিষয় উত্থাপন করিয়া কোনরূপ কথার প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি কহিলেন, তাঁহার দুঃখ দূর কর, আমি তাদৃশ ব্যবহারে তাঁহার অশান্তি দূর করিতে যাইব না। তিনি তাহাই করিলেন। তাঁহার পরিবারাদির ভরণপোষণযোগ্য ধনদানের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

আর এক সময়ে উলানিবাসী মহাদেব মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ-

পান্তিকে কহিলেন, তুমি আমাকে কিছু বিষয়-বিভব করিয়া দেও, আমি প্রকৃত মূল্য দিব। কৃষ্ণপান্তি কহিলেন, সময় হইলে দিব। এক সময়ে ঢাকা জিলার পাটপসারনামক পরগণা নিলাম হইতেছিল, কৃষ্ণপান্তির নামে খরিদ হইল। তখন উহা অতি অল্প মূল্যে খরিদ হইয়াছে শুনিয়া তিনি কহিলেন, "উলোর বামনঠাকুর মুখিয্যে মহাশয় মহাদেবকে এই বিষয়টা দিলাম।" ভ্রাতা ও পুত্রাদি পরিজনবর্গ এবং আত্মীয়গণ নিষেধ করিল। তিনি উত্তর করিলেন, আমি অগ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যদি সস্তাদরে কোন বিষয় পাই তবে উহা মহাদেব মুখোপাধ্যায়কে দিব। তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের নামেই পাটপসারের জমীদারী স্থির হইল। এইটিই উলার বাবুদিগের ঐশ্বর্য্যের মূল ভিত্তিস্বরূপ।

কৃষ্ণপান্তি এতাদৃশ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, দস্যুতস্করাদি তাহাদিগের ঈঙ্গিতানুসারে নাম নির্দ্দেশ করিলে কৃষ্ণপান্তির প্রতিশ্রুত দেয় পুরস্কার পাইত। কৃষ্ণপান্তির নাম শুনিলে কদাচ দস্যুতস্করাদি তাঁহার অশুভসাধন করিত না। ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা।

দানশীলতায় ও সমস্ত সৎকর্ম্মেই তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার বিত্তশাঠ্য ছিল না। অতিথি-অভ্যাগত, আতুর ও দুঃখীর দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাঁহার জমীদারী-কাছারীতে একটি পৃথক্ ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে। তাঁহার জমীদারীমধ্যে কেহ পাল চৌধুরীদিগকে প্রজাপীড়ক কহিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধর প্রজা-রঞ্জনকারী সদাশয়

ভূস্বামী বলিয়াই সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁহার গুণে পাল চৌধুরী বংশ ধার্ম্মিক ও বিনীত বলিয়াই লোকের আশীর্ব্বাদের পাত্র।

তিনি নিজে সমস্ত সম্পত্তি উপার্জ্জন করিলেও ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও জমীদারী তিন ভ্রাতার মধ্যেই সমাংশে বিভাগ করিয়া লয়েন। এরূপ ব্যক্তির নাম চিরকাল লোকের নিকটে সমাদৃত থাকিবে।

আদর্শ প্রশ্ন।

দুঃখিজনের গৃহে জন্মিলে কি লোকের মন উচ্চ হয় না? উচ্চমনার লক্ষণ কি? কৃষ্ণপান্তি কি গুণে মহামনা বলিয়া পরিগণিত? শ্রীশ্রী৺ যুগলকিশোর দেবের সেবাকারী মহান্তমহারাজের অন্তঃকরণের পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিলে, কৃষ্ণপান্তি ও মহান্ত এই উভয়ের কাহাকে প্রকৃত মহান্ বলা যায়? মহান্তকে "মহারাজ" বলা হইয়াছে, উহা কি প্রকৃত হইয়াছে? মহারাজ শব্দের অর্থের সঙ্গে মহান্তের উপাধির সামঞ্জস্য কর। নিধিরাম ও কৃষ্ণপান্তি যে হাটে হাট করিতেন সে স্থানের নাম গাঙ্‌নাপুর; পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে গঙ্গা নদীর জলোচ্ছ্বাস আসিত বলিয়াই কি উহার নাম গঙ্গাপুর অথবা গাঙ্‌না-পুর? 'পুর' এবং 'পূর' শব্দের কোন্‌টি দিলে গাঙ্‌নাপুরের পুরের অ ঠিক হয়? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও কৃষ্ণপান্তি দীনহীন বাল্য-সুহৃদ্‌দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? তাহার দৃষ্টান্ত দেও। কৃষ্ণপান্তির সত্যনিষ্ঠায় ইংরাজ সওদাগর ও দেশীয় সম্ভ্রান্তগণ অথবা দস্যু তস্করাদি ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে কি ভাবে দেখিতেন? তদ্দ্বারা কৃষ্ণপান্তির কি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল? সত্যনিষ্ঠাদি, সৌভাগ্যলক্ষ্মী, হীনপ্রকৃতি, কৃতার্থ, মহানুভাব, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, আনুষঙ্গিক, যুগলমূর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, প্রত্যুৎপন্ন-মতি, সুপ্রসন্ন, উৎকৃষ্ট, পূর্ব্ববৎ, ভরণপোষণ, মূলভিত্তিস্বরূপ ও সমদর্শী এইগুলির ব্যুৎপত্তি বল এবং সমস্তপদগুলির সমাসের নামোল্লেখপূর্ব্বক ব্যাসবাক্য লিখ।

নীতি-মালা

১। সত্য পরম ধর্ম্ম।

যে ব্যক্তি সত্যবাদী সকলেই তাহার কথায় বিশ্বাস করেন। তাঁহার কোন সময়েই ক্লেশ হয় না। তিনি লোকসমাজে পূজ্য এবং পরমেশ্বরের পরম অনুগ্রহভাজন হয়েন।

দেখ, রাম পিতৃসত্য পালনজন্য রাজ্যভোগ বিসর্জ্জন দিয়া চৌদ্দবৎসরের নিমিত্ত বনগমন করিয়াছিলেন। কত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তথাপি একদিনের জন্য আপনাকে অসুখী জ্ঞান করেন নাই। যুধিষ্ঠির সত্যধর্ম্ম পালননিমিত্ত ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস ও একবর্ষ কাল অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। অজ্ঞাত বাস-সময়ে শবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। তথাপি সত্যপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। তাঁহারা সত্যধর্ম্ম প্রতিপালননিমিত্ত ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করেন নাই। সেই হেতু সকল লোকেই তাঁহাদিগের নিমিত্ত দুঃখিত ছিলেন। তাঁহাদিগের গুণের প্রশংসা করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিমাত্র তাঁহাদিগের যথাসাধ্য উপকার করিতেন। এখনও তাঁহাদিগকে লোকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া গণনা করেন। এবং উপদেশ দিবার সময়ে তাঁহাদিগের নাম দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করেন। দেখ, তাঁহারা কত কাল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অদ্যাপি পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে জীবিত

ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান হইতেছে। তাঁহারা সত্যবাদী ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহাদিগের মহিমা কেহ ভুলিতে পারে নাই। এমন কি আর্য্যদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধকার্য্যেও স্বর্গীয় ব্যক্তির তৃপ্তিসাধনজন্য যুধিষ্ঠিরাদির স্তুতি এবং দুর্য্যোধনাদির নিন্দা-কীর্ত্তন হয়।

সত্যবাদী হইতে চেষ্টা কর, তোমরাও লোকের নিকট পরম মান্য হইবে, আপনাকে সুখী জ্ঞান করিবে এবং পরমেশ্বরের প্রিয় পাত্র হইবে।

যতপ্রকার পুণ্য কার্য্য আছে, সত্যপালন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথাপি একটি নীতিবাক্য এরূপ প্রচলিত আছে যে, সত্য কথা বলা সর্ব্বতোভাবে উচিত, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলা বিধেয় নহে। ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। কোন ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়াছে অথবা সন্তান তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত, সেরূপ অবস্থায় তাহার জনকজননী অথবা তৎসদৃশ দুঃখভাগী ব্যক্তি তাহার শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার মৃত্যু বা মৃত্যুকল্পনারূপ অশুভ বাক্য বলা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন করাই ভাল। বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে কিছুই বলা উচিত নহে।

২। অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিবে।

কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা জন্মিবামাত্র তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ অগ্রে ঐ কার্য্যের গুণ ও দোষ বিচার করা উচিত, তাহা হইলে পশ্চাতে বিপদে পড়িতে হয় না। নতুবা সেই কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইবামাত্র নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তৎপরে বিপদে পড়িতে আর বিলম্ব থাকে না। সেই কারণে পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, যে কার্য্য করিতে মনের সঙ্কোচ জন্মে সে কার্য্য কদাচ করিবে না। যাহা করিলে মন পবিত্র হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

যেমন চলিবার সময়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া পাদবিক্ষেপ করিলে পতিত হইতে হয়। পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য অস্বচ্ছ জলপানে যেরূপ পীড়া জন্মে। কথা কহিবার সময় সত্য কথা না বলিলে যেমন বিপদে পড়িতে হয়। তদ্রূপ যে কার্য্যে মনের পবিত্রতা না জন্মে, তাহাতে বিপদ্ব্যতীত কদাচ সুখ ঘটে না। অতএব কথা কহিবার সময়ে সত্য বাক্য বলিবে। চলিবার সময়ে দৃষ্টিপূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করিবে। জল পান করিবার সময়ে স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত জল পান করাই কর্ত্তব্য। কার্য্যারম্ভে মনের পবিত্রতাবোধ না হইলে সে কাজ করিবে না। সদ্‌বিবেচকের সহিত পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুধাবন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই বিধেয়।

৩। এক মুহূর্ত্তে কোন কার্য্যের ফললাভ হয় না।

দেখ, প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ হইতে অঙ্কুরের জন্ম হয়। তাহার বৃদ্ধিতে তৃণ জন্মে। তৃণগুলি শাখা পল্লবে শোভিত হয়, পরে বৃক্ষ ও লতাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তখন উহাতে ফলোম্মুখ কুসুমের উদ্গম হয়। ক্রমে তাহাতে শস্যের সঞ্চার হইতে থাকে। শস্যের মধ্যে রসের সঞ্চার হইয়া ঘন হইয়া আসিলে

ফলের পুষ্টি হয়। তৎপরে উহা যথাযোগ্যরূপে ফল বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং একটি ফল যেমন একদিনে হয় না, সেইরূপ কোন কার্য্যই এক মুহূর্ত্তে হইতে পারে না। একটি মহাবৃক্ষ কতকালে হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্যের জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জন্মমাত্র কেহ জ্ঞানী ব বলিষ্ঠ হইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও বলের বৃদ্ধি হয়। যাহা দেখিতেছ সে সমুদায়ই ক্রমশঃ হইয়াছে। যাহা ক্ষণমাত্রে হয়, তাহা ক্ষণমাত্রে লয় পায়। দেখ, হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ প্রাণী ও দংশমশকাদি ক্ষুদ্রজীব, ইহাদের মধ্যে কে কত কাল বাঁচে ও কাহার শরীর কত কালে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৪। বিদ্যাই প্রকৃত ধন।

এই সংসারে ধন ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, সেই হেতু ধন প্রার্থনীয় বস্তু। প্রয়োজনীয় পদার্থের নাম ধন। ধন জ্ঞাতিগণ বিভাগ করিয়া লইতে পারেন। দস্যুতস্করাদিতে লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারে। কিন্তু যে ধন জ্ঞাতিরা কদাচ ভাগ করিতে এবং চৌরাদি দুর্বৃত্ত নরাধমবর্গ কোনরূপেই অপহরণ করিতে সমর্থ না হয়, এবং যাহা দানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—সেই ধনকে মহাধন বলা হইয়া থাকে। সে ধন কি? উহা বিদ্যারূপ অমূল্য মহারত্ন। এই রত্ন যিনি অধিকার করিয়াছেন তিনি নরশিরোমণি। বিদ্বান্ ব্যক্তি কুরূপ হইলেও তাঁহার মর্য্যাদার হানি হয় না। বিদ্যার গৌরবে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। অর্থ দান করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা-ধন দান করিলে ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহার এই এক আশ্চর্য্য

শক্তি। অতএব বিদ্যারূপ মহারত্ন উপার্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। ধনহীন হইলে ধনীকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি নানাপ্রকার বিপদে পড়িলেও এক প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

বিদ্যা উপার্জ্জনের কালাকাল নাই। আপনাকে অজর ও অমর জ্ঞান করিয়া নিয়ত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যত্নবান্ হওয়া অতীব আবশ্যক। নতুবা মূর্খতা দূর হয় না। মূর্খলোক যমতুল্য। তাহাদ্বারা সংসারের অনিষ্ট ব্যতীত কখনই শুভফল হয় না। ভূলোকের যতটুকু উপকারসাধন হইয়াছে তৎ সমুদায়েরই সঙ্ঘটন বিদ্বান্ ব্যক্তি দ্বারা হইয়াছে। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে, তখন লোকে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য স্থির করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানবিহীন জনে ও পশুতে কিছু প্রভেদ দেখা যায় না।

বিদ্যাবলে মানবগণ কি না করিতেছেন? ইয়ুরোপীয় সুসভ্য মহানুভাবগণ বিদ্যাবলে যাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন, যাদৃশ অর্থসমন্বিত এবং লোকের নিকটে যাদৃশ মান্য হইয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক আলো এবং রসায়নবিদ্যার উৎকর্ষ ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

৫। উদ্যোগ ব্যতীত কোন কাজ সিদ্ধ হয় না।

হইয়া বসিয়া থাকে, তাহার ভাগ্যে কখনও লক্ষ্মীর দৃষ্টি হয় না। সে ব্যক্তিকে সকলেই কাপুরুষ বলে। যে ব্যক্তি কার্য্যকরণে উদ্যমশীল তাহার কার্য্যসাধনের উপকরণ না থাকিলেও উদ্যোগের সহিত ক্রমে সমুদায় উপায়গুলি উপস্থিত হইতে থাকে। উদ্যমশীল ব্যক্তির সৌভাগ্যের উদয় হইতে আর কোন প্রতিবন্ধক ঘটে না। উদ্যোগী পুরুষ অদৃষ্টের ফল বা ভাগ্যের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন না। সুতরাং লক্ষ্মী নিরাশ্রয়া না থাকিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করেন। শ্রীমন্ত ব্যক্তিরাই প্রায় ধার্ম্মিক, দয়ালু ও সদাশয় হয়েন। ভূলোকে ইঁহারাই সুখী বলিয়া গণ্য।

তোমরা সকল কার্য্যেই উদ্যোগী হও, অবশ্য ভাগ্যবন্ত হইবে।

৬। মিত্র বা বন্ধু।

সূর্য্যালোক ব্যতীত যেমন কোন জীবই বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ মিত্র ব্যতীত এই সংসারে কোন ব্যক্তিই একদণ্ড কালও থাকিতে পারে না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশিগণকে মিত্ররূপে গণনা করিতে হয়। ইঁহাদিগের নিকটে সুখদুঃখাদির কথা না বলিয়া থাকা যায় না। যে ব্যক্তি পরিবারবর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার ও প্রতিবেশীর হিতচিন্তা করেন তাঁহার পক্ষে সকল ব্যক্তিই মিত্র। সকলে তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় দেখিয়া থাকেন।

এই ভূমণ্ডলে কত শত সদাশয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগের মনে খলতা বা কপটতার লেশমাত্র নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই

অন্যের শুভসাধনজন্য সযত্ন থাকেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে পারিলেই নিজকে সুখী মনে করেন। এইরূপ লোকই প্রকৃত বন্ধু নামের যোগ্য।

আবার এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাহারা লোক-সমক্ষে প্রিয়বাদী হয়েন, অসাক্ষাতে কার্য্য হানি করেন, সেরূপ লোককে মিত্র বলা যায় না। সেরূপ লোক প্রকৃত শত্রুনামের যোগ্য। তাহাদিগের প্রকৃতি এরূপ কলুষিত যে, তাহারা লোকের মন্দ চেষ্টাতেই থাকে এবং অপরের অশুভ শুনিলেই আপনাকে আহ্লাদিত জ্ঞান করে। তাহাদিগের মন অতি ক্ষুদ্র। এইপ্রকার স্বভাবের লোক যখন অন্যের সহিত বন্ধুতা করে, তখন মধুমাখা কথায় লোকের অন্তঃকরণের কবাট খুলিয়া ফেলে। পরে তাহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আপনার অন্তরের বিষ ঢালিয়া দেয়। এইরূপ মিষ্টভাষী ধূর্ত্ত মিত্রের ব্যবহারে কত শত লোক প্রতারিত হইয়াছেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। অতএব শঠ বন্ধুর সহবাস ত্যাগ করিবে।

৭। মূর্খের জ্ঞান।

নৃপতিগণ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না করিয়াও কেবল বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে ঘটনার বিবরণ শুনিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কোন বিষয় না দেখিলেও কেবল বুদ্ধিবলে কার্য্যাকার্য্য অবধারণ করিতে পারগ হয়েন। কোন বস্তু পশুগণের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও, তাহারা ঘ্রাণদ্বারা আপনাদিগের ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা বুঝিয়া লইতে পারে। তদনুসারে তাহারা সাবধান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,

মূঢ় ব্যক্তিবর্গ কোন কার্য্য গত না হইলে তাহার ফলাফল কদাপি অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, রাজারা কাণে শুনিয়া কাজ করেন। পণ্ডিতেরা নিজ বুদ্ধিবলেই সমস্ত দেখিতে পান। পশুরা গন্ধ দ্বারা সমস্ত বুঝিতে পারে। কিন্তু মূর্খলোক কার্য্য সম্পন্ন না হইলে বুঝিতে পারে না।

৮। যাহার যে প্রকৃতি তাহার কদাচ পরিবর্ত্তন হয় না।

যেমন নিম, চিরতা প্রভৃতি বস্তু শর্করামিশ্রিত হইলেও স্বীয় স্বীয় তিক্ত ভাব ত্যাগ করে না। অঙ্গারকে শত শত বার ধৌত করিলেও যেমন তাহার মলিনতা দূর হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তির প্রকৃতি স্বভাবতঃ মন্দ, তাহার প্রকৃতির কদাচ পরিবর্ত্তন হয় না। উত্তম প্রকৃতি কখনও মন্দ হয় না। যেমন, দুগ্ধ স্বভাবতঃই মধুর।

কেহ কেহ বলেন অসৎ প্রকৃতিকে সৎ করা যায়। তাহা-দিগের মত এই যে, সদুপদেশ দ্বারা মন্দ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গ ও সদুপদেশের গুণে মন্দ ভাব অন্তর্হিত হয়। যেমন, অগ্নিসংযোগে অঙ্গারের মলিনত্ব দূর হয় ও অঙ্গার তেজোময় ভাব ধারণ করে। আবার কোন কোন ব্যক্তি বলেন, যাবৎকাল অগ্নির সহিত অঙ্গারের যোগ থাকে তাবৎকালই অঙ্গার শুদ্ধবর্ণ ধারণ করে কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যে অঙ্গার সেই অঙ্গারই থাকে। উহার প্রকৃতির কোন রূপান্তর হয় না। সেই রূপ অসৎলোক তেজস্বী ব্যক্তির নিকটে পরাভব স্বীকার করে

বটে, কিন্তু তেজোহীন সদ্ব্যক্তিকেও মলিন করিতে থাকে। যেমন, বিষ যে দ্রব্যের সহিত সংলগ্ন হয় সেই বস্তুকেই বিষময় করিয়া তোলে। দেখ বিষাক্ত বস্তু ভোজন করিবামাত্র জীবগণ প্রাণত্যাগ করে। অতএব তোমরা অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ ও অসদালাপ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

আদর্শ প্রশ্ন।

নীতি কাহাকে বলে? সমস্ত সদ্গুণের মূলে কি থাকিলে ইহজগতেই লোক সকল পূজ্য হয়? উদাহরণ দেখাও। পুণ্য কার্য্যের মধ্যে কি কর্ম্ম করিলে সমুদায় ধর্ম্মরক্ষা হয়? অপ্রিয় সত্য বলা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন করা ভাল একথা বলে কেন? অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য একথা বলে কেন? নীতিমালার ৩য় শিরোনাম হইতে ৮ম শিরোনাম পর্য্যন্ত যে যে কয়েকটী উপদেশ আছে উহার পৃথক্ তাৎপর্য্য লেখ।

চারু-প্রবন্ধ।

পদ্যাংশ।

মৃত্যুকালে রাবণের উপদেশ।

দশানন বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে মাথে মোর দেহ শ্রীচরণ॥
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী।
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী॥
অপরাধ মার্জ্জনা করহ মহাশয়।
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময়॥
লক্ষ্মণ বলেন দোষ নাহিক তোমার।
যোগাযোগে যত দেখ লিপি বিধাতার॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি পরম পণ্ডিত।
পাঠালেন রাম মোরে শুধাইতে নীত॥
লক্ষ্মণের বাক্য কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ নীত সংসারে রামের অগোচর॥
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে॥
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ।
দয়া করে একবার দেন দরশন॥

শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু বিদ্যমান॥
দয়া করি যদি রাম আসেন এখানে।
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে॥
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের আগে আসি সবিশেষ কন॥
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন॥
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে।
উঠিতে না পারে রাবণ বিষম প্রহারে॥
স্তুতিবাক্যে কহিলেন আমার সাক্ষাতে
একবার আনিয়া দেখাও রঘুনাথে॥
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি।
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি॥
শ্রীরাম বলেন তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত॥
দশানন বলে মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ॥

করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ॥
আলস্যে রাখিলে কর্ম্ম পুন হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার ॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে ॥
শূন্য হতে দেখিলাম যমের ভবন।
তিন দ্বারে নানস্থানে আছে সাধুজন।
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা ॥
অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড ॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে ॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে ॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায় ॥
পূরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে ॥
হেলায় রহিল পড়ে না হয় পূরণ।
তার পর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ ॥

কুণ্ড পূরাইব যবে করিনু মনন।
তখনি পূরালে পূর্ণ হইত সে পণ॥
হেলাতে রাখিনু ফেলে না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ সমুদ্র মাঝে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
একদিন মনেতে হইল এই কথা।
সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছে লবণ সমুদ্র সলিলেতে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব আমি সমুদ্রের জল॥
ক্ষীরোদ সমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে॥
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে না পারি
এই রূপ হেলাতে অনেক দিন গেল।
তদন্তর তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল॥
সমুদ্র সিঞ্চন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মন হলে শুভ কর্ম্ম করিবে তখনি॥

হেলায় রাখিলে কার্য্য পূর্ণ নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব।
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে জীবগণ যত॥
যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্ছিত॥
সকলের শক্তি নহে যাইতে তথায়।
কেহ কেহ দৈবশক্তি অনুসারে যায়॥
এ শক্তি বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে॥
মনে সাধ করে সদা যাইতে অমরে।
দৈব শক্তি হীন তারা যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনায়াসে যেতে সব পারে দেবলোকে।
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মা ডেকে॥
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে॥
থাকিবে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সংসারে পৌরুষ।
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ॥
তখনি কত্তেম যদি হৈল যবে মনে।
কোন্ কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে॥

হেলায় রাখিয়ে হৈল বহু দিন গত।
তার পর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত ॥
অতএব শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়া সে বাসনা বৃথা হলো ॥
শ্রীরাম বলেন শুন লঙ্কা অধিপতি।
শুভ কর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে যুকতি ॥
সুকৃতি কর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তর।
পাপকর্ম্ম পক্ষে কিছু কহ আর বার ॥
পাপকর্ম্ম হেলা করে রাখে যে জনেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে ॥
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি ॥
দশানন বলে তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর ॥
পাপকর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রামচন্দ্র তোমার সাক্ষাতে ॥
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
শূর্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে ॥

শূর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নাহি কালি সীতা আনিব পশ্চাতে॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিব পাছে আনা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর সীতার জন্যেতে॥
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোন কালে॥
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতি কথা।
কহিতে কহিতে জিভে হইল জড়তা॥
শ্রীচরণ দৃষ্টি করে প্রাণত্যাগ কৈল।
জয় জয় শব্দ হেন সুরপুরে হৈল॥

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু॥
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দায়া করিয়াছি ত্যাগ
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে না ছাড়ে ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থুলা মহামতি॥

তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চালনন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন॥
আমাযোগ্যা নহে এই দ্রুপদকুমারী।
(সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী)॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিল বামপাণি॥
টঙ্কারিয়া গুণ পুন বলেন আচার্য্য।
বসাইয়া দিব গুণ এ কোন আশ্চর্য্য॥
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপেতে॥
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণমৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে ছিদ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ॥

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্রপথে॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
ঊর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া
চক্রচ্ছিদ্রপথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহা শব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্রচ্ছিদ্রপথে হানে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান॥
দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন॥
বাম হস্তে ধরি ধনু দিয়া পদ ভর।
খসাইয়া গুণ পুন দিল বীরবর॥

টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
উর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান॥
ছাড়িলেন বাণ বায়ুসম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে॥
সুদর্শনচক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া॥
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে, দ্রুপদকুমার॥
দ্বিজ হৌক ক্ষত্র হৌক বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি।
লভিবে সে দ্রৌপদীরে দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চালনন্দন॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন গেল তথা হেন রীতে॥
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে॥

যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি চাহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে।
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে॥
বলিলেক ক্ষত্রগণ লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহুধন॥

সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইল বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখিয়া মজিবে দ্বিজকুল॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকট ধনঞ্জয় যান তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কার্য্যে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী সেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান॥

কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার ॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব ॥”
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন ॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানু লম্বিত।
করিকর যুগবর জানুসুবলিত ॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত ॥
নিশ্চিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে ॥
প্রণাম করেন বীর ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥

লক্ষবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি ।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী ।
লক্ষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয় ।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে ।
চক্রচ্ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক্য নয়ন ।
সেই মৎস্য যেই জন করিবে বিন্ধন ॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর ।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়িল অর্জ্জুন ॥
মহাশব্দে মৎস্য বিন্ধি হইলেক পার ।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
ভেদিল ভেদিল বলি হৈল মহাধ্বনি ।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা ।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানি সব নৃপমণি ।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনি ॥

ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিতে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয়।
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে করে জলে নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে কেহ বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয়।
শূন্য হতে মৎস্য যদি কাটিয়া পড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হল পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে॥

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয় বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে বিন্ধিব ততবার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সভাজন স্থিরনেত্রে দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে যত রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী ;—
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরি আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ;
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ;
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ;
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম;
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন !
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি,
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে;
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে!
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে, আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল?
দেবী কন, দিব, আগে পারে ল'য়ে চল।
যার নামে পার করে ভব-পারাবার,
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার।
বসিয়া নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনী বলিছে, মা গো, বৈস ভাল হয়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল,
আল্‌তা ধুইবে, পদ কোথা রাখি বল?
পাটনী বলিছে, মা গো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে।

বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়,
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়,
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি উপরে,
তাঁর ইচ্ছা বিনা, ইথে কি তপ সঞ্চারে ?
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে।
সোণার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয় ;
এত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।
তটে উত্তরিল তরি, তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।
সেউতি লইয়া কক্ষে, চলিল পাটনী ;
পিছে দেখি তারে, দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল,
দিয়াছ যে পরিচয় বুঝিনু সে ছল।
হের দেখ সেঁউতিতে রেখেছিলা পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয় !
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়।
তপ জপ নাহি জানি, ধ্যান জ্ঞান আর,
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়,
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়।

ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিলা হাসিয়া,
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা, প্রকাশ কাশীতে,
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব,
বর মাগ মনোনীত, যাহা চাহ দিব।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান,
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায় ;
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল,
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল।
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়,
সোণার সেঁউতি দেখি করিলা প্রত্যয়।
আপন মন্দিরে গেলা প্রেম ভয়ে কাঁপি ;
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ;
গন্ধে আমোদিত ঘর, নৃত্য বাদ্য গান ;
কে বাজায়, নাচে গায়, দেখিতে না পান।
পুলকে পূরিল অঙ্গ, ভাবিতে লাগিলা ;
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা ;

এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে ;
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে।
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার,
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা পূজা কৈল কত কব তার,
নানা মতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার।

সরমার প্রতি সীতা।

"ছিনু মোরা, সুলোচনে! গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে, ছিনু ঘোর-বনে,
নাম পঞ্চবটী ; মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাব দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী।—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি, কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি!
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্ত্তক-নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনু ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে; পালিতাম পরম-যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসী মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে;

সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়ন-মণি ? হে দারুণ বিধি !
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে ; হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি, সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে।
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার-ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে)।
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম মুঞ্জরিত যবে

দম্পতী মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব-তারাবলী
নব নিশিকান্ত-কান্তি। কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি—
বিশাল রসাল-মূলে। কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে
আগম, পুরাণ, বেদ-পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি !
নানা কথা। এখনও এ বিজন-বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর-বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি !
সে সঙ্গীত ?”

পরশমণি।

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন!

অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,

বিধাতানির্ম্মিত চারু-মানব-নয়ন।

পরশমণির সনে, লৌহ-অঙ্গ পরশনে,

সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ বচন,—

এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,

বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।

কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,

ইহারি পরশগুণে মানব-বদন

দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,

মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোণার কিরণ।

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,

কোথা বা এ শশধর কোথা বা ভানুর কর,

কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত।

কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জোছনা ধ'রে,

তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে?

কেবা এই সুশীতল, বিমল গঙ্গার জল,

ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে?

কে দেখাত তরুকুল, নানারঙ্গে নানাফুল,

মরাল, হরিণ, মৃগে, পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু-আলো তুলে　　সাজায়ে বিহঙ্গকুলে,
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?
দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল,　　হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী-অঙ্গে,　　নয়ন-মণির সঙ্গে,
না হয় মানব চিত্তে আনন্দদায়িনী।
নদীজলে মীন খেলে,　　বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে তৃণেতে হিমানী,
পক্ষী পাখা উড়ে যায়　　পিপালি শ্রেণীতে ধায়
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী !
তাতেও আনন্দ হয়—　　অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।
ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ;
ইহারি পরশবলে　　সখায় সখায় গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে,
শিখায় প্রেমের বেদ　　ঘুচায় মনের ভেদ
প্রণয় আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল,　　প্রেম-ভোগবতী-জল,
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে ;
যুগল নক্ষত্র দুটি,　　যেখানে বেড়ায় ছুটি,

সখারূপে মনসুখে পৃথিবী উপরে।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায় রে বিধি—
গেলে চলে চিরদিন অই আশা ধরে!
অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন!
জননী-বদন-ইন্দু জগতে করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত-শশি-রশ্মি-মাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন-আনন;
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

দিল্লী ও জুমা মস্‌জিদ্।

একি সেই দিল্লী হায়! এই সে নগরী?
যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নিখিল ধরণী?
ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ অমর-বাঞ্ছিত,
মুসলমান সম্রাটের প্রিয় রাজধানী?

জুমা মস্‌জিদ (দিল্লী)।

কুতুব্-মিনার (দিল্লী)।

Sreenath Press Dacca
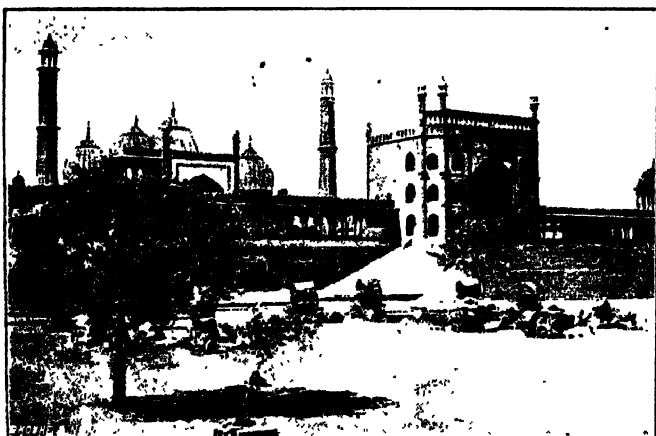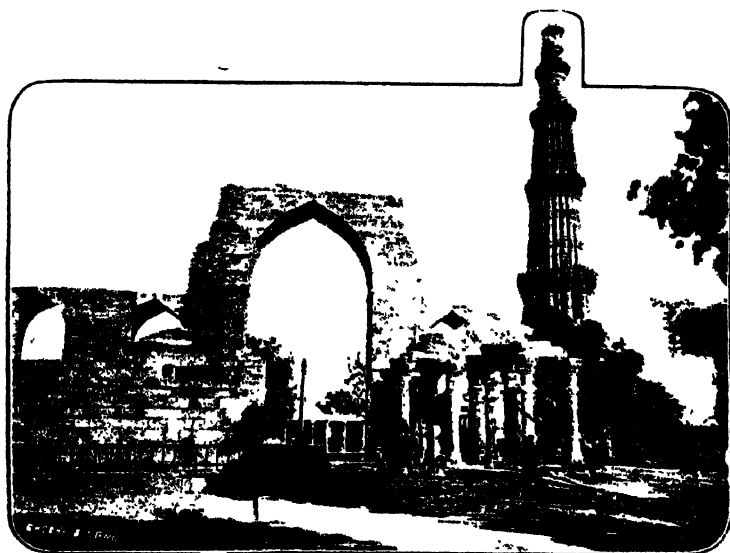
সেই দিল্লী এই কি রে! কনক-রঞ্জিত,
মণিমুক্তাসুশোভিত কুসুম-সজ্জিত
শ্বেত মর্ম্মরের চারু হর্ম্ম্যে অগণিত
বিভূষিত বক্ষ যার? আলোকের হারে,
কুসুম-স্তবকে, রত্নে, চির-উজ্জ্বলিত
যে নগরী? কুঞ্জবন সুশোভিত যার
প্রস্রবণে, ক্রীড়াভূমে,—কোকিলা-কূজনে
দোয়েল, শ্যামার তানে, পাপিয়া-পঞ্চমে
রমণী কণ্ঠের চারু ললিত সপ্তমে
মুখরিত নিশিদিন? সৌন্দর্য্যে যাহার
ইন্দ্রের অমরাবতী সতত লজ্জিত?
যাহার প্রতাপে—শৌর্য্যে কাঁপিত ধরণী?
মুসলমান গৌরবের বিজয়-কেতন
উড়িত এ দিল্লী-দুর্গে; যার বীর-রবে,
বহিত ভীষণ ঝড় সমগ্র ভারতে।
অতুল মোস্‌লেম-কীর্ত্তি-মুকুট উজ্জ্বল
শোভিত ইহার শিরে কনক-রঞ্জিত
অনুপম। ইস্‌লামের পবিত্র কিরণে
আছিল এ সমুজ্জ্বল দিবস রজনী।
ওই দেখ দাঁড়াইয়া মর্ম্মর-নির্ম্মিত
কি সুরম্য অট্টালিকা জুমা মস্‌জিদ্
ত্রিদিব হইতে আনি অবনী মাঝারে

স্থাপন করিলা কেহ নয়ন-রঞ্জন।
এ হেন সুরম্য হর্ম্ম্য অতুল জগতে ;
একবার নিরখিলে মোস্‌লেম-হৃদয়
অপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোতে হয় নিমগন।
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মরি, সম্মুখে তাহার
মনোহর স্তম্ভদ্বয়, উঠিলে তাহাতে
দিল্লীর অপার শোভা বিমোহিত প্রাণে
মধুর স্বপ্নের ছায়া দেয় বিছাইয়া।
দৃশ্যগুলি কি সুন্দর নয়নাভিরাম,
কমনীয় পটে যেন রয়েছে চিত্রিত!
মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণে এক মর্ম্মর-আধারে
সুনির্ম্মল পূতোদক রক্ষিত যতনে
ওজু তরে। সুবিশাল মস্‌জিদ্ ভিতরে
একটি মর্ম্মর বেদী, খাজিত তাহাতে
শাজাহান সম্রাটের হস্তলিপি, হায়,
রয়েছে অঙ্কিত চারু উজ্জ্বল অক্ষরে।
উত্তর পূরব কোণে একটি প্রকোষ্ঠে
পবিত্র কোরাণ এক রক্ষিত যতনে।
এই পূত মহাগ্রন্থ অমূল্য জগতে
মহাত্মা মোর্ত্তজা-আলী লিখিত অক্ষরে
সুশোভিত প্রতিপৃষ্ঠা যার। উচ্চশিরে
ইস্‌লাম-গৌরবরাশি এ মহা প্রাসাদে

বহিছে নীরবে সদা গম্ভীর বিষাদে।
ইহার সুশুভ্র চারু মর্ম্মর চত্বরে,
অগণিত ছাত্রবৃন্দ আনন্দ-অন্তরে
করিত কোরাণ পাঠ মধুর নিঃস্বনে!
বসন্তে, শরতে কিংবা গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
প্রতি নিশি অবসানে ঊষার প্রাক্কালে
ওই উচ্চ মনোহর পবিত্র মিনারে
দাঁড়াইয়া মোয়াজ্জেম গম্ভীর আজানে
জাগাইত মোহমুগ্ধ নিদ্রিত মানবে।
প্রতিদিন পঞ্চবার মোস্লেম-নিচয়
আসিত ছুটিয়া হেথা—আপনি সম্রাট্
আসিতেন নিত্য হেথা ভজনের তরে।
পবিত্র রমজানমাসে নিশীথ সময়ে
তারাবীর সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
প্লাবিয়া মস্‌জিদ্‌ গৃহ মধুর-সুস্বনে
উঠিত আকাশ-পথে কোরাণের শ্লোকে
মন-প্রাণ-মোহকর কিবা তৃপ্তিময়
আত্ম-বিস্মৃতির সুরা করিত বর্ষণ
ধর্ম্মপ্রাণ মোস্লেমের হৃদয়-কন্দরে।
"এক ভিন্ন অন্য নাই উপাস্য জগতে"
এ পবিত্র পুণ্য কথা হইত ধ্বনিত
সেই স্থানে এই সেই পবিত্র নগরী।

স্বভাবের শোভা।

একদা নিদাঘ-কালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন।
উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সমান
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান,
নির্ব্বাত-তড়াগ-সম হ'য়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগভীর শান্ত-দরশন।
তরু'পরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সুধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।
ভুবন-ব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস
বোধ হয় প্রকৃতি-বদন ভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
চেয়ে দেখি সুনির্ম্মল সুনীল আকাশে,

সমুজ্জ্বল অগণন তারকা প্রকাশে,
যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে।
অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে।
বিকসিত-কামিনী-কুসুম-তরু-তলে
বসিলাম চিন্তা-সখী-সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়ন-রঞ্জিনী,
নিরমল নীরময়ী মৃদুল-গামিনী
মন্দ মন্দ বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কল-স্বরে করে কুল কুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।
আম, জাম, নারিকেল, গুবাক, তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল!
শশি-করে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায়!
কোথাও মাধবী সহ জড়িত হইয়া,
সহকার নদী'পরে পড়েছে বাঁকিয়া।
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে
মুখ দেখিতেছে তারা পুলকিত মনে।
কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,

কোথাও তেঁতুল ডাল হেলিয়া রয়েছে ;
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে, সমীরণ-ভরে।
সারি সারি তরণী দু-ধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।
এইরূপ প্রকৃতির রূপ দরশনে
আহা ! কি বিমল সুখ উপজিল মনে !
শিহরিল কলেবর পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল ;
মনে মনে কহিলাম, অয়ি সুপ্রকৃতে !
শোভনে, বিচিত্র-চারু-ভূষণে-ভূষিতে !
মরি মরি, কিবা তব মোহিনী মূরতি !
নিরখি নয়নে হ'ল জড়-প্রায় মতি।
অপরূপ তব রূপ, এক রূপ নয়,
নব নব রূপ ধর, সময় সময়।
যখন প্রাবৃট্-কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগন-মণ্ডল,
ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীম রবে গরজে গভীর,
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,

ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে,
কদম্ব কেতকী আদি কুসুম-নিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে,
তখন তোমার চারু রূপ দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?
সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন,
ফুল্ল-ফুল-দূর্ব্বাদল-চারু-আভরণে
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্য বদনে ;
বিহঙ্গ-নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত,
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?

মহম্মদের ঋণশোধ।

১

মহান্ পুরুষ কহিলা কাতরে
প্রয়াণ সময় জানি
কার কাছে আমি আছি ঋণে বাঁধা,
দেহ তারে ডাকি আনি।

ঋণদায় রাখি, যে ত্যজে সংসার
স্বর্গে তার নাহি ঠাঁই,
তাহারে তারিবে, নরক হইতে
হেন পুণ্য কিছু নাই।

২

নগরের পথে ফিরিছে সেবক
কহিতেছে সবে ডাকিয়া,
মহাপুরুষের কাছে পাবে যাহা
লহ গিয়া ত্বরা চাহিয়া।
প্রয়াণ সময় উপস্থিত তাঁর
ডাকিছেন তিনি কাতরে,
যে পাইবে যাহা, লহ আসি হেথা।
অঋণী করহ আমারে।

৩

দিন শেষ হ'ল আসিল না কেহ,
লইবারে কিছু চাহিয়া,
ব্যাকুল অন্তর, শেষ পয়গম্বর,
কার কথা যেন স্মরিয়া।
কোন্ পাশে বাঁধা পবিত্র পরাণ
ছাড়িতে না পারে দেহ,
কাহারে চাহেন কাতর নয়নে
বুঝিতে না পারে কেহ।

৪

ওমার, ওসমান, আবুবেক্কর
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে,
এ শেষ মুহূর্ত্তে কোন্ কথা মনে
কি যাতনা প্রভু দেহে ?
কাতরে কহিলা মহান্ পুরুষ
হয় নাই ঋণ শোধ,
পারে না ছাড়িতে পরাণ এ দেহ,
তাই এ যাতনা বোধ।

৫

আবার ঘোষিল সেবক সকল
নগরের পথ ভ্রমিয়া,
ঋণী যার কাছে মহান্ পুরুষ
সে এস ত্বরায় চলিয়া।
ঘোষণা শুনিয়া লইবারে ঋণ
আসিল যুবক এক,
সিপাহীর বেশ কঠোর-প্রকৃতি
আরব নিবাসী সেখ।

৬

গৃহে প্রবেশিয়া কহিলা যুবক
হে রসুল পয়গম্বর,
মম পৃষ্ঠদেশ করিয়াছ ক্ষত
হানি কোড়া দৃঢ়তর।

সেই ঋণ আজি শোধ লইবারে
এই যে এসেছি আমি।
আঘাত বদলে আঘাত করিয়া
সে কোড়া তেমনি হানি।

৭

প্রসন্নবদনে কহিলা রসুল
কি সুখ ইহার কাছে ?
ঋণ হবে শোধ, আন সেই কোড়া
ফতেমার গৃহে আছে।
নেহারি কষার কঠিন মূরতি,
শিহরে সেবকগণ,
মহান্ পুরুষ কহিলেন বন্ধু
লহ ঋণ এইক্ষণ।

৮

কাঁদিতে কাঁদিতে সেবকের দল
কহিল সে যুবকেরে,
কষাঘাত ভাই সহিবেনা দেখ
ওই জীর্ণ কলেবরে।
হানি দশ কোড়া আমাদের পিঠে
লহ তুমি প্রতিশোধ।
মহাপুরুষেরে দিওনা যাতনা,
রাখ এই অনুরোধ।

৯

ওমার, ওসমান, ভকত প্রধান
আবুবেক্কর, আলি।
কাতরে কহিলা দিব হে যুবক
সহস্র রতন ডালি।
দুনিয়ার মাঝে যাহা চাহে নর
দিব তোমা সব আনি,
লহ প্রতিশোধ অথবা মোদের
পৃষ্ঠেতে এ কোড়া হানি।

১০

কহিল যুবক চাহিনা সম্পদ
ধনের নহে এ ঋণ,
আঘাত বদলে করিব আঘাত
চাহিনা দুনিয়ার দীন।
তোমরা ত কেহ নহ মোর ঋণী
ঋণী এ পয়গম্বর,
তাঁরি পৃষ্ঠদেশে হানি লব শোধ
বৃথা কথা স্বতন্তর।

১১

পৃষ্ঠ পাতি দিয়া ডাকেন রসুল
লহ বন্ধু লহ ঋণ,
কর মোরে মুক্ত পাপভার হতে
উজলি উঠুক দীন্।

কোড়া হাতে লয়ে কহিল যুবক
“পৃষ্ঠে আছে আবরণ,
মম পৃষ্ঠ দেশ আছিল উলঙ্গ
আঘাতিলে যেই ক্ষণ।”

১২

অমনি তখন সে মহাপুরুষ
ফেলাইলা আবরণ,
হাসিতে হাসিতে কহিলেন বন্ধু
হান তবে এইক্ষণ।
পরম বান্ধব কর মোরে মুক্ত
আজিকে তোমার ঋণে,
এই ঋণ ভারে বড় যাতনায়
আছি আমি নিশি দিনে।

১৩

মুক্ত পৃষ্ঠ মাঝে দেখিল যুবক
কি যে সে উদার প্রাণ,
কি ঢালিল সুধা শ্রবণে তাহার
বন্ধু বন্ধু আহবান।
কি পবিত্র জ্যোতি দেখিল বদনে,
স্বর্গের জ্যোছনা রাশি,
পাপ তাপ ভরা দুনিয়ার মাঝে
পুণ্য উঠেছে হাসি।

১৪

প্রেমের বাতাসে শিহরিল চিত,
মুদিয়া আসিল আঁখি,
অবশ অঙ্গ পড়িল ঢলিয়া
সে কোড়া দূরেতে রাখি।
ভকতি প্রেমেতে আপনারে দিল
মহাপুরুষের পায়,
বেড়িয়া তাহারে বিশ্বাসী সকলে
জয় জয় জয় গায়।

নাজির উদ্দিন।

নাজির উদ্দিন নামে দিল্লীর ঈশ্বর
সম্পদগরব-হীন অমল-অন্তর।
বিদ্বান্, বিনয়ী, সদাচার-পরায়ণ,
প্রজাহিতে রত, দীন-অনাথ-শরণ।
অশন, বসন, শয্যা, ধর্ম্ম-আচরণ,
ইন্দ্রিয়সংযম, রাজঋষির মতন।
ছিল না পাঠান-নৃপে হেন সদাশয়,
সদা তাঁর হৃদয়ে জাগিত ধর্ম্মভয়।

আর আর মুসলমান ভূপতির মত,
নাহি ছিল আড়ম্বর, দাস দাসী শত।
সৈন্য, সেনাপতি, রাজারক্ষা সমুচিত,
পারিষদ পাত্রমিত্র ছিল নিয়োজিত।
বিদ্রোহদমন আর শত্রুনিবারণ,
ইহা বিনা যুদ্ধ নাহি ঘটিত কখন।
ধীরভাবে সন্ধি শান্তি করিয়া স্থাপন,
বিংশতি বৎসর রাজ্য করিলা শাসন।
নিরন্তর ধর্ম্মশাস্ত্র করি আলোচনা,
ক্রমশ করিলা বহু পুস্তক রচনা।
তাহাহ'তে সঞ্চিত হইত যেই ধন,
তাইমাত্র ছিল তাঁর জীবিকাসাধন।
একমাত্র পতিব্রতা পত্নী ছিল তাঁর,
তাঁরি প্রতি ছিল সব গৃহকার্য্য-ভার।
একদা রন্ধনকালে অঙ্গুলি পুড়িয়া,
কহিলা ভূপের কাছে কাতরা হইয়া।
একা আমি, এই গৃহ-কার্য্য সমুদয়,
করিতে না পারি এবে কষ্টবোধ হয়।
রাখিলে একটি দাসী কিছুকাল তরে,
সারিবে অঙ্গুলি মোর এই অবসরে।
নিরখি অঙ্গুলি, দীন মহিষীর মুখ,
কহিলা নৃপতি ধীরে পরকাশি দুখ।

কাল হ'তে আমি নিজে রুটি বানাইব,
কিছুকালতরে তোমা অবসর দিব।
আমি রাজা, রাজকোষে আছে যেই ধন,
শুধু তাহা প্রজাহিত করিতে সাধন।
এখন আমার নহে, সকলি প্রজার,
ধনের রক্ষক আমি, এই জ্ঞান সার।
যদি এই ধন নিজ সুখের লাগিয়া,
করি অপব্যয় মোহকুহকে ভুলিয়া,
চরমে পাইতে হবে নরক-যাতনা,
তাই বলি পরিহর এহেন বাসনা।
তুমি ধর্ম্মপত্নী মোর, ধর্ম্মের সহায়,
তুচ্ছ দুঃখে পাপপথে নিও না আমায়।
পাইতেছ কষ্ট তুমি, সঁপি প্রাণমন,
ডাকহ খোদাকে তিনি বিপদভঞ্জন।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা।

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
"শুন মোর কথা ধনি, নিন্দ বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তাই ক্ষুদ্রকায়া করি, সৃজিল তোমারে!

মলয় বহিলে হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকরভরে তুমি পড় লো হেলিয়া ;
হিমাদ্রিসদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষকুলস্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত তাপন তপন,
আমি কিলো ডরাই কখন ?
দূরে রাখি গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে,
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ।
শুন, ধনি, রাজকাজ দরিদ্রপালন।
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন,
কেহ অন্ন রাঁধি খায়,
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে,
সদা আসি সেবা করে,
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন,
মধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে,
তুমি কি তা জাননা ললনে ?

দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি,
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুখ দেখি আমি দুখী,
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ বিধুমুখি।"
নীরবিলা তরুরাজ, উড়িল গগনে,
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে,
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরবসমরে।
মহাঘাতে কড়মড়ি,
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে,
হারাইলা আয়ুঃসহ দর্প বনস্থলে !
উচ্চশির যদি তুমি কুল মান ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে।

পদ্যাংশের আদর্শ প্রশ্ন।

(১) মৃত্যুকালে রাবণ রামকে কি হিতকথা বলেন?

(২) দ্রৌপদী কিজন্য স্বয়ংবর সভায় অর্জ্জুনের গলদেশে বরমাল্য দেন নাই তাহা বল।

(৩) অন্নদা কিরূপ কথায় পাটনীকে ছলনা করেন তাহার দুই চারিটী শব্দ লেখ।

(৪) সীতাদেবী অশোকবনে কাহার সহিত সখীভাবে বিশ্বাস-পূর্ব্বক কিরূপ আলাপ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ কর।

(৫) পরশমণির প্রকৃতি বর্ণন কর।

(৬) দিল্লী ও জুমামস্‌জিদের আশ্চর্য্যদর্শন বিষয়ক কিছু বর্ণন কর এবং ঐতিহাসিক কথাও লিখ।

(৭) স্বভাবের শোভা যে মনুষ্য না বুঝে তাহাকে কোনরূপে বুঝাইতে হইলে কিরূপ বর্ণন করিবে তাহা কর।

(৮) মহম্মদের ঋণপরিশোধ এই ঋণের সহিত সামান্য ধনের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা দেখাও।

(৯) নাজীর উদ্দিনের সংগ্রহ বাক্যের ফল কথা বর্ণন কর।

(১০) রসাল ও স্বর্ণলতিকা প্রস্তাবের সারসংগ্রহ পূর্ব্বক অল্প কথায় সমুদায় প্রকাশ কর।

Bharat Mohila Press, Dacca.